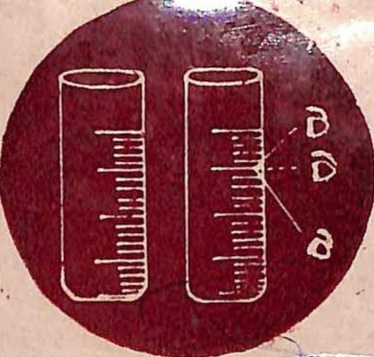
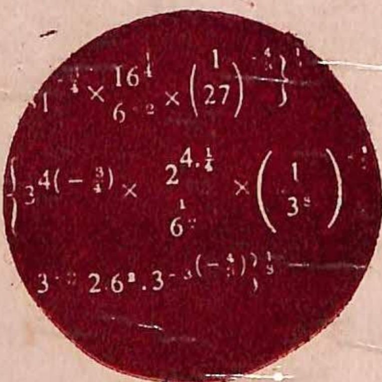
বিনয় দত্ত

বিজ্ঞানের মজা

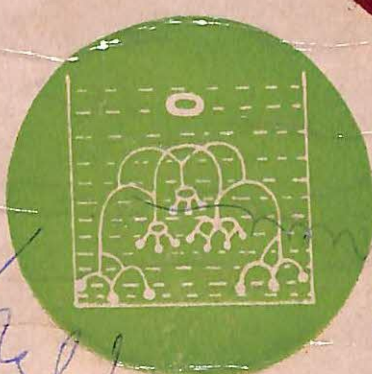
রসায়ন













[illegible] //[illegible]

বিজ্ঞানের মজা

রসায়ন

বিনয় দত্ত

জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
দিলীপ চক্রবর্তী
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৯৩
৩রা অক্টোবর ১৯৮৬

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
১৫ নভেম্বর ১৯৮৮

ভেতরের ছবি : মীনা মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
গীতা রাণী চ্যাটার্জী
প্রগতি প্রিন্টার্স
৭৫, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

পনের টাকা

বিজ্ঞানের মজা

রসায়ন

বিজ্ঞান এক উজ্জ্বল আলোক শিখা! বিজ্ঞানের জগৎ যেন এক স্বপ্নের জগৎ! বিজ্ঞান যেন এক অন্বেষণ! এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করাই হল বিজ্ঞান।

আর এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে প্রকৃতির নিয়মগুলি। বিজ্ঞান অবশ্য প্রকৃতির নিয়মগুলি পরিবর্তন করতে পারে না, তবে প্রকৃতির নিয়মগুলি কিভাবে ব্যবহার করলে তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে সেই পথ বলে দিতে পারে।

তোমাদের মনে এই প্রকৃতির নিয়মগুলি জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই বই। এখানে রসায়ন বিজ্ঞানের কয়েকটি সহজ অথচ মজার পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তবে বিজ্ঞানের বই পড়ে শুধু মজা পেলেই চলবে না, সেই সঙ্গে জানতে হবে প্রকৃতির রহস্যকে। এই কথা মনে রেখে এই বইয়ে প্রত্যেকটি পরীক্ষার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে তোমরা অতি সহজেই তা বুঝতে পার। তোমরা বুঝতে পারলেই, আনন্দ পেলেই আমার লেখা সার্থক।

১. ১০. ১৯৮৬ লেখক

Science, like that Nature to which it belongs is neither limited by time nor space, it belongs to the world and is of no country and of no age.

Humphry Davy

বিজ্ঞান, তা যার অন্তর্গত সেই প্রকৃতির মত, সময় বা স্থান কোনকিছু দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞান কোন দেশের ও নয়, কোন যুগেরও নয়, বিজ্ঞান হল সমস্ত বিশ্বের।

হামফ্রি ডেভি

সূচীপত্র

পরিবেশ দূষণ :—৬০

বিজ্ঞানের মজা

রসায়ন

লেখকের অন্য বই

বিজ্ঞানের মজা (পদার্থবিদ্যা)
বিজ্ঞানের মজা (অংক)

১। শূন্য গ্লাসে সাদা ধোঁয়া !

প্রয়োজন ঃ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, লিকার অ্যামোনিয়া, একটি কাচের গ্লাস ও একটি প্লেট।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপর একটি খালি কাচের গ্লাস রয়েছে, তুমি একটি খালি প্লেট উপুড় করে তা দিয়ে গ্লাসটিকে ঢেকে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটি সাদা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। সবাই তো অবাক !

প্রস্তুতি ঃ তুমি আগে থেকেই প্লেটে কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিব অ্যাসিড আর গ্লাসে কয়েক ফোঁটা লিকার অ্যামোনিয়া লাগিয়ে রাখবে।

ব্যাখ্যা ঃ লিকার অ্যামোনিয়া হল অ্যামোনিয়া গ্যাসের গাঢ় জলীয় দ্রবণ, এ থেকে অ্যামোনিয়া বেরিয়ে আসবে, আর অ্যামোনিয়া বায়ু থেকে হাল্কা বলে তা গ্লাসের ভিতরে উপর দিকে উঠবে, আর গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস বেরিয়ে আসবে। এই গ্যাস বায়ু থেকে ভারী বলে নীচের দিকে নামবে, তখন অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl উৎপন্ন হবে। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সাদা কঠিন পদার্থ, কিন্তু উৎপন্ন হওয়ার সময় সূক্ষ্ম চূর্ণাকারে থাকায় তা সাদা ধোঁয়ার মত লাগবে।



পরীক্ষা 1

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

একটি কথা ঃ রসায়নের পরীক্ষাগুলি করবার সময় খুব সতর্কভাবে করবে। মনে রাখবে সব রাসায়নিক পদার্থই বিষাক্ত। বিশেষ করে সীসা (লেড), পারদ (মার্কারি), ক্রোমিয়াম, অ্যান্টিমনি ইত্যাদি মৌলিক এবং তাদের যৌগিকগুলো অতি বিষাক্ত। সুতরাং ল্যাবরেটরিতে যতক্ষণ থাকবে বা কোন রাসায়নিক পদার্থ ধরার পর হাত ভাল করে না ধুয়ে কখনও চোখে মুখে হাত দেবে না।

কোন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষার সময় গ্যাস যেন বাতাসে ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে।

যে সব পরীক্ষায় অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন হয় বা পরীক্ষার ফলে আগুন জ্বলে ওঠে সেই সব পরীক্ষাও সাবধানে করবে। সহজদাহ্য গ্যাস বা রাসায়নিক সম্বন্ধেও সতর্ক থাকবে।

২। রক্ত রক্ত !

প্রয়োজন : ফেরিক ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট।

পদ্ধতি : একটি ছুরি দিয়ে হাতের এক জায়গায় লাগাতেই সেই জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেল। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল।

প্রস্তুতি : আলাদা আলাদা ভাবে দুটো কাচের পাত্রে ফেরিক ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের গাঢ় দ্রবণ তৈরী কর। তারপরে ছুরিটা ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে রাখ। হাতের এক জায়গায় লাগাও অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট দ্রবণ। এবার ছুরিটা হাতের যেখানে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট দ্রবণ লাগিয়েছিলে সেখানে ঠেকাতেই রক্তের মত লাল রং সৃষ্টি হল।

ব্যাখ্যা : অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট (NH_4CNS) এবং ফেরিক ক্লোরাইডের ($FeCl_3$) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রক্তের মত লাল ফেরিক ফেরিথায়োসায়ানেট উৎপন্ন হয়।

$$6NH_4CNS + 2FeCl_3 = 6NH_4Cl + Fe\,[Fe\,(CNS)_6]$$

ফেরিক ফেরিথায়োসায়ানেট

রসায়ন বিজ্ঞানে এই পরীক্ষার সাহায্যে ফেরিক আয়নের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। ফেরিক ক্লোরাইডের পরিবর্তে যে কোন দ্রবণীয় ফেরিক লবণ ব্যবহার করা যায়। এমনকি হিরাকস (ফেরাস সালফেট) ব্যবহার করলেও হয়, কারণ হিরাকসের মধ্যে সবসময় অল্প পরিমাণ ফেরিক সালফেট মেশানো থাকে।

৩। বিনা তাপে আগুন !

প্রয়োজন : পটাসিয়াম ক্লোরেট (বাজি তৈরী করার পটাস), চিনি ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি : টেবিলে একটি চিনামাটির পাত্রে বা কাপে কিছু সাদা রঙের চূর্ণ আছে। তুমি একটি শিশি থেকে একটু তরল পদার্থ কিছুটা উপর থেকে কাপে ঢালতেই তাতে আগুন জ্বলে উঠল।

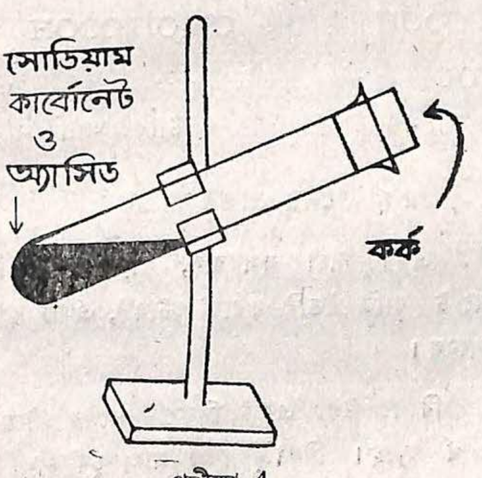
প্রস্তুতি ঃ কিছুটা চিনি ভাল করে গুঁড়ো কর। এবার সমপরিমাণে চিনির গুঁড়ো আর পটাসিয়াম ক্লোরেট ভাল করে মেশাও। এই মিশ্রণ কাপে রাখ, এখন একটা শিশি থেকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড কাপে ঢালতেই আগুন জলে উঠবে। ঢালবার সময় সাবধানে ঢালবে যাতে তোমার গায়ে না আগুন লাগে। আর এই মিশ্রণ যেন আগুনের সংস্পর্শে না আসে, কারণ তাহলেই দপ করে জলে উঠবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমে পটাসিয়াম ক্লোরেটের ($KClO_3$) সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) বিক্রিয়ার ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (ClO_2) উৎপন্ন হচ্ছে। চিনির ($C_{12}H_{22}O_{11}$) সঙ্গে এই ক্লোরিন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় চিনিতে আগুন ধরে যাচ্ছে।

$$KClO_3 + H_2SO_4 = KHSO_4 + HClO_3$$
$$3HClO_3 = HClO_4 + 2ClO_2 + H_2O$$
$$C_{12}H_{22}O_{11} + 12ClO_2 = 6Cl_2 + 12CO_2 + 11H_2O$$

৪। রাসায়নিক বন্দুক !

প্রয়োজন ঃ সোডিয়াম কার্বনেট (কাপড় কাচা সোডা) বা সোডিয়াম বাই-কার্বনেট (খাওয়ার সোডা), লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা ভিনিগার



পরীক্ষা 4

বা লেবুর রস বা তেঁতুল গোলা জল, একটি টেস্ট টিউব ও তার মুখের ছিপি, একটি লোহার স্ট্যাণ্ড ও একটি ক্ল্যাম্প।

পদ্ধতি ঃ টেস্ট টিউবে কিছুটা সোডিয়াম কার্বনেট বা বাই-কার্বনেটের চূর্ণ নাও, এর পরে টেস্ট টিউবটাকে লোহার স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে ভাল করে আটকাও। এবার কিছুটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা ভিনিগার বা লেবুর রস বা তেঁতুল গোলা জল টেস্ট টিউবে ঢেলে মুখটা ছিপি দিয়ে আটকে দাও। একটু পরেই জোর শব্দ করে ছিপিটা টেস্ট টিউবের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে (পরীক্ষা 4)। টেস্ট টিউবের মুখের সামনে কেউ দাঁড়াবে না।

ব্যাখ্যা ঃ সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) বা সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের ($NaHCO_3$) সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) বা ভিনিগারের অ্যাসেটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) বা লেবুর রসের সাইট্রিক অ্যাসিড বা তেঁতুলের টারটারিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রতি ক্ষেত্রেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের CO_2 সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসের প্রচণ্ড চাপের ফলেই ছিপি ছিটকে বেরিয়ে আসে।

$$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$$

$$Na_2CO_3 + 2CH_3COOH = 2CH_3COONa + CO_2 + H_2O$$

$$\begin{array}{l} CH_2COOH \\ | \\ C(OH)COOH \\ | \\ CH_2COOH \end{array} \qquad \begin{array}{l} CH(OH)COOH \\ | \\ CH(OH)COOH \end{array}$$

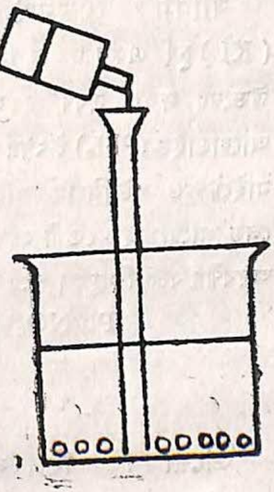
সাইট্রিক অ্যাসিড   টারটারিক অ্যাসিড

৫। জলের ভেতর আগুন !

প্রয়োজন ঃ একটু সাদা ফসফরাস, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম ক্লোরেট (বাজি তৈরি করার পটাস), একটি কাচের বিকার ও একটি থিসল ফানেল।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপর একটি বিকারে জলের নীচে কয়েক টুকরো সাদা কঠিন পদার্থ আছে। বিকারে কিছু সাদা চূর্ণ ঢালা হল। এবারে একটি শিশি থেকে থিসল ফানেলের সাহায্যে বিকারের নীচে কিছু তরল পদার্থ ঢালতেই সাদা কঠিন পদার্থে জলের নীচেই আগুন ধরে উঠল (পরীক্ষা 5)।

প্রস্তুতি ঃ বিকারে কিছু জল নাও। এবার সামান্য একটু সাদা ফসফরাসকে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে বিকারের জলে ফেলে দাও। জলের নীচে ফসফরাসে একটু পটাসিয়াম ক্লোরেটের চূর্ণ লাগাও। জলের বাইরে ফসফরাস যেন পটাসিয়াম ক্লোরেটের সংস্পর্শে না আসে কারণ তাহলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। এবার থিসল ফানেলের সাহায্যে জলের নীচে অল্প একটু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল, তাহলেই ফসফরাস জ্বলে উঠবে।



পরীক্ষা 5

ফসফরাস খুব বিষাক্ত, সেই জন্য কখনও হাত দিয়ে ধরবে না, সবসময়ই চিমটা দিয়ে ধরবে। আর কাটার সময় জলের নীচে ডুবিয়ে রেখে কাটবে। সাদা ফসফরাস হাতে লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তুঁতের দ্রবণে হাত ধুয়ে ফেলবে। আর প্রয়োজনের সময় ছাড়া ফসফরাসকে জলের ভেতর ডুবিয়ে রাখবে, কারণ বাতাসে রাখলে সাধারণ উষ্ণতাতেই ফসফরাসে আগুন ধরে যেতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় ('বিনা তাপে আগুন' দেখ)। এই ক্লোরিন ডাই-অক্সাইডের সংস্পর্শে এলে সাদা ফসফরাসে (P) জলের ভেতরেই আগুন ধরে যায়।

$$8P + 10ClO_2 = 4P_2O_5 + 5Cl_2$$

৬। সাদা জলে ফেললেই হলুদ!

প্রয়োজন ঃ লেড নাইট্রেট, পটাসিয়াম আয়োডাইড ও একটি টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি ঃ একটি টেস্ট টিউবে কিছু জল নেওয়া হল। এবার একটু সাদা চূর্ণ জলে ফেলতেই জলের রং হলুদ হয়ে গেল!

প্রস্তুতি ঃ লেড নাইট্রেট এবং পটাসিয়াম আয়োডাইড উভয়েই সাদা রঙের। আলাদা আলাদা ভাবে এই দুটির চূর্ণ প্রস্তুত কর, তারপর সমপরিমাণে

উভয় চূর্ণ মিশ্রিত কর। মিশ্রণের রঙও হবে সাদা। এই মিশ্রণ জলে মেশালেই জলের রঙ হয়ে যাবে হলুদ।

ব্যাখ্যা ঃ লেড নাইট্রেট [$Pb(NO_3)_2$] এবং পটাসিয়াম আয়োডাইডের (KI) চূর্ণ একসঙ্গে মেশালেও কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু উভয়ের জলীয় দ্রবণ একসঙ্গে মেশালেই বিক্রিয়া হয় এবং হলুদ রঙের লেড আয়োডাইড (PbI_2) উৎপন্ন হয়। এখানে মিশ্রিত চূর্ণ জলে ফেললেই লেড নাইট্রেট ও পটাসিয়াম আয়োডাইডের দ্রবণ উৎপন্ন হয়ে মিশ্রিত হচ্ছে, ফলে লেড আয়োডাইড তৈরী হচ্ছে, জলের রঙও হলুদ দেখাচ্ছে। লেড আয়োডাইড অদ্রবণীয় বলে কিছুক্ষণ পরে নীচে থিতিয়ে পড়বে।

$$Pb(NO_3)_2+2KI=PbI_2+2KNO_3$$

৭। জলে জল মেশালেই নীল!

প্রয়োজন ঃ হিরাকস আর পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড অথবা ফেরিক ক্লোরাইড আর পটাসিয়াম কোয়োসায়ানাইড এবং দুটো টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি ঃ দুটো টেস্ট টিউব অর্ধেক জলে পূর্ণ আছে। এবার প্রথম টেস্ট টিউব থেকে কিছু জল দ্বিতীয় টেস্ট টিউবে ঢাললেই দ্বিতীয়টির জল গাঢ় নীল হয়ে গেল।

প্রস্তুতি ঃ একটি টেস্ট টিউবে হিরাকস অথবা ফেরিক ক্লোরাইডের দ্রবণ নাও, অন্য টেস্ট টিউবে নাও যথাক্রমে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড অথবা ফেরোসায়ানাইডের দ্রবণ। সব দ্রবণই খুব পাতলা নেবে তা হলে বর্ণহীন জলের মত দেখাবে। এবার এক টেস্ট টিউবের দ্রবণ অন্য টেস্ট টিউবে ঢাললেই নীল রঙ সৃষ্টি হবে।

ব্যাখ্যা ঃ হিরাকস (ফেরাস সালফেট, $FeSO_4$) এবং পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড [$K_3Fe(CN)_6$] এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় গাঢ় নীল রঙের অদ্রবণীয় ফেরাস ফেরিসায়ানাইড, $Fe_3[Fe(CN)_6]_2$ বা টার্ণবুলের নীল। অন্যদিকে ফেরিক ক্লোরাইড, $FeCl_3$ এবং পটাসিয়াম কোরাসায়ানাইড [$(K_4FeCN)_6$] এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় গাঢ় নীল বর্ণের অদ্রবণীয় ফেরিক ফেরোসায়ানাইড, $Fe_4[Fe'(CN)_6]_3$ বা প্রুশিয়ান নীল।

$$3FeSO_4+2K_3Fe(CN)_6=Fe_3[Fe(CN)_6]_2+3K_2SO_4$$

$$4FeCl_3+3K_4Fe(CN)_6=Fe_4[Fe(CN)_6]_3+12KCl$$

৮। জলে জল ঢাললেই দই !

প্রয়োজন ঃ সাধারণ খাদ্য লবণ, সিলভার নাইট্রেট ও দুটি টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি ঃ দুটো টেস্ট টিউব কিছু জলপূর্ণ আছে, একটি টেস্ট টিউব থেকে কতকটা জল অন্য টেস্ট টিউবে ঢাললেই সাদা দই তৈরী হয়ে গেল।

প্রস্তুতি ঃ একটি টেস্ট টিউবে খাদ্য লবণের ও অন্য টেস্ট টিউবে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ নাও। দুটি দ্রবণ মেশালেই দইয়ের মত একটি জিনিস তৈরী হবে। সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ ডিস্টিল্ড ওয়াটারে প্রস্তুত করবে, সাধারণ জলে প্রস্তুত করলে দ্রবণ ঘোলা হবে, সেক্ষেত্রে এই দ্রবণকে ফিল্টার করে নিতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ খাদ্য লবণ, NaCl এর সাথে সিলভার নাইট্রেট, $AgNO_3$-এর বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় সিলভার ক্লোরাইড AgCl উৎপন্ন হয়। একে সাদা দইয়ের মত দেখায়।

$$AgNO_3 + NaCl = AgCl + NaNO_3$$

৯। যে আগুনে বারুদও জ্বলে না !

প্রয়োজন ঃ সাদা ফসফরাস, একটি টেস্ট টিউব ও তার ছিপি এবং একটি সরু কাচের নল।

পদ্ধতি ঃ একটি টেস্ট টিউবের মাথায় সরু নল লাগানো আছে। নলের মুখে সবুজ আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই শিখা এত ঠাণ্ডা যে একটি দেশলাই কাঠির বারুদের দিক এতে ধরলেও জ্বলবে না।



পরীক্ষা 9

প্রস্তুতি ঃ প্রথমে ছিপির মাঝখানে ছিদ্র করে তাতে আট-নয় সে. মি. লম্বা একটি কাচের নল ঢুকিয়ে রাখ, এবার টেস্ট টিউবে কিছু জল নিয়ে কয়েক মিনিট ফোটাও। এর ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ভিতরের বাতাস বাইরে বার করে দেবে, এখন খুব ছোট এক টুকরো ফসফরাস টেস্ট টিউবের জলের নীচে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নল লাগান ছিপি দিয়ে টেস্ট টিউবের মুখ বন্ধ করে দাও। টেস্ট টিউবের জল আবার ফোটালে নলের মুখে সবুজ শিখা

দেখা যাবে। ঘর অন্ধকার হলে শিখা ভালভাবে বোঝা যাবে (ফসফরাস সম্বন্ধে সতর্কতার জন্য 'জলের ভেতরে আগুন' দেখ)।

ব্যাখ্যা : জল ফোটাবার ফলে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সাদা ফসফরাসের বাষ্পও নলের মুখে আসে। এখানে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ফসফরাস বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগের ফলে সবুজ শিখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই শিখার উষ্ণতা এত কম যে বারুদও জ্বলে না।

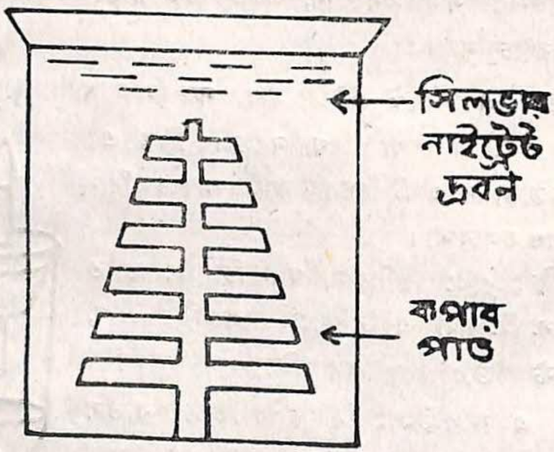
$$4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$

১০। বরফ গাছ !

প্রয়োজন : তামার পাত, সিলভার নাইট্রেট, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ও একটি বিকার।

পদ্ধতি : একটা বিকারে জলের মধ্যে গাছের আকারে কাটা একটি তামার পাত ডুবিয়ে রাখা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তামার লাল গাছটি আস্তে আস্তে সাদা বরফ গাছে পরিণত হচ্ছে।

প্রস্তুতি : একটা তামার পাতকে গাছের আকারে কেটে নাও, এবার ডিষ্টিল ওয়াটারে সিলভার নাইট্রেটের খুব লঘু দ্রবণ তৈরী কর একটি বিকারে।



পরীক্ষা 10

বিকারের দ্রবণের মধ্যে তামার গাছটিকে ডুবিয়ে রাখ। তামার গাছটি ধীরে ধীরে সাদা হয়ে যাবে (পরীক্ষা 10)।

ব্যাখ্যা ঃ সিলভার নাইট্রেটের ($AgNO_3$) সঙ্গে তামার (Cu) রাসায়নিক ক্রিয়ায় সিলভার বা রূপা উৎপন্ন হল। এই রূপা তামার উপর জমা হওয়ায় গাছটি সাদা হয়ে গেল।

$$2AgNO_3 + Cu = Cu(NO_3)_2 + 2Ag$$

১১। লেবুর ভেতর রক্ত !

প্রয়োজন ঃ একটি পাতি লেবু, একটি ছুরি আর কিছু নীল লিটমাস দ্রবণ।

পদ্ধতি ঃ একটি লেবুকে ছুরি দিয়ে কাটার সঙ্গে সঙ্গে লেবুর ভেতর থেকে রক্ত বার হল।

প্রস্তুতি ঃ এখানে যা কিছু কৌশল সব ছুরির মধ্যে। ছুরিটাকে নীল লিটমাস দ্রবণে ডুবিয়ে তারপর শুকিয়ে নাও, আবার লিটমাস দ্রবণে ডুবিয়ে শুকাও। এভাবে তিন চারবার কর, এবার ওই ছুরি দিয়ে যে কোন সাধারণ পাতি লেবুকে কাটলেই রক্তের মত তরল পদার্থ বার হবে।

ব্যাখ্যা ঃ তোমরা জান অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাস লাল হয়ে যায়। লেবুর মধ্যে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড, ছুরির নীল লিটমাস এই সাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় লাল হয়ে যায়, ফলে মনে হয় লেবুর ভেতর থেকে রক্ত বার হচ্ছে।

১২। ডুবুরী মথবল !

প্রয়োজন ঃ কয়েকটি মথবল (ন্যাপথেলিন বল, ভিনিগার বা যে কোন লঘু অ্যাসিড, কাপড় কাচা সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) বা খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট) এবং একটি কাচের গ্লাস।

পদ্ধতি ঃ একটি জলপূর্ণ কাচের গ্লাসে কতকগুলি মথবল ছেড়ে দেওয়া হল। দেখা গেল বলগুলো একবার ভেসে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে। এভাবে বলগুলো ক্রমাগত ওঠানামা করতে থাকবে।

প্রস্তুতি ঃ গ্লাসে কিছু কাপড় কাচা সোডা বা খাবার সোডা রাখ, তার উপর ভিনিগার বা যে কোন লঘু অ্যাসিড ঢেলে দাও, এরপর গ্লাস জলপূর্ণ করে তাতে কয়েকটা মথবল ছেড়ে দাও, প্রয়োজন হলে জলটা নেড়ে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে কাপড় কাচা সোডা বা খাবার সোডার সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে, ('রাসায়নিক বন্দুক' দেখ)। যখন বলগুলো তলায় পৌঁছোয় তখন এই গ্যাসের বুদবুদগুলো বলের গায়ে লেগে যায় এবং বলগুলোকে উপরে ঠেলে দেয়। উপরে এসে গ্যাসের বুদবুদগুলো ফেটে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশে যায়। তখন মথবলগুলো জলের চেয়ে ভারী হওয়ার জন্য জলে ডুবে যায়।

কখনও কখনও দেখা যায় বলগুলো ঠিকমত ভেসে উঠতে পারছে না। তাহলে বুঝতে হবে জলের ঘনত্ব কম হয়েছে, এক্ষেত্রে জলের মধ্যে প্রয়োজনমত নুন মেশাও যাতে জলের ঘনত্ব বাড়ে এবং বলগুলো ঠিকমত ওঠানামা করতে পারে।

১৩। ফুলের রঙ কোথায় গেল ?

প্রয়োজন ঃ একটি বড় মুখওয়ালা কাচের বোতল, এই বোতলের ছিপি বা মুখ, গন্ধক, লাল ফুল ও একটি ছোট কাপ।

পদ্ধতি ঃ বোতলের ভেতর লাল ফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, নীচে একটি কাপে কিছু পুড়ছে, লাল ফুল আস্তে আস্তে সাদা হয়ে গেল।

প্রস্তুতি ঃ ফুলগুলো ভিজিয়ে নাও, এবার একটা সুতোর একপ্রান্তে ফুলগুলো বাঁধ। সুতোর অন্যপ্রান্ত বোতলের ছিপি বা মুখের সঙ্গে কাগজ এবং আঠার সাহায্যে এমনভাবে আটকে দাও যাতে ছিপি বন্ধ করে দিলে ফুলগুলো বোতলের ভিতর ঝুলতে থাকে। এবার কিছু গন্ধক কাগজে মুড়ে একটা কাপে রাখ, কাপটা বোতলের ভিতর রাখ। এখন গন্ধক মোড়া কাগজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ছিপি বা মুখ আটকে দাও। গন্ধক পুড়তে থাকবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে লাল ফুল সাদা হয়ে যাবে (পরীক্ষা 13)।



পরীক্ষা 13

ব্যাখ্যা ঃ গন্ধক পুড়লে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস (SO_2) উৎপন্ন হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড ভিজা ফুলের জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে জায়মান

হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। এই জায়মান হাইড্রোজেন ফুলের রঙের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বর্ণহীন যৌগিক উৎপন্ন করে, ফলে লাল ফুল সাদা হয়ে যায়।

$$S+O_2=SO_2$$

$$SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2H$$

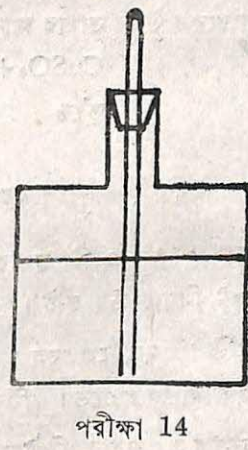
সতর্কতা : সালফার ডাই-অক্সাইড বিষাক্ত শ্বাসরোধকারী গ্যাস, সেই জন্য এই গ্যাস যাতে নিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখবে। এই গ্যাস জলে দ্রবণীয়। পরীক্ষার পর বোতলে জল ঢেলে মুখ বন্ধ করে ভাল করে ঝাঁকাও, সালফার ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। তখন এই জল ফেলে দাও।

১৪। মজার ফোয়ারা !

প্রয়োজন : একটি বোতল, কাচের নল, বোতলের ছিপি (কর্ক), যে কোন লঘু অ্যাসিড এবং কাপড় কাচার সোডা বা খাবার সোডা।

পদ্ধতি : জলে ভর্তি বোতলের মধ্যে একটি কাচের নল লাগানো আছে। দেখা গেল নলের ভিতর দিয়ে ফোয়ারার মত অবিরাম জল বাইরে বেরিয়ে আসছে।

প্রস্তুতি : সম্ভব হলে নলের একটা মুখ ড্রপারের মুখের মত সুঁচলো করে নাও। মুখের কাছে গরম করে মুখটা টেনে ধরলেই সুঁচলো হয়ে যাবে। বোতলের কর্কে ছিদ্র করে তার মধ্যে নলটা প্রবেশ করিয়ে দাও, সরু মুখটা কর্কের উপরে বেরিয়ে থাকবে। বোতলের চার ভাগের তিন ভাগ যে কোন লঘু অ্যাসিডে ভর্তি কর। এবার কাপড় কাচা সোডা বা খাবার সোডা একটি কাগজে মুড়ে বোতলের জলে ফেলে দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ক লাগিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে দাও। লক্ষ্য রাখতে হবে বোতলের মুখ যেন বায়ুনিরুদ্ধ ভাবে বন্ধ হয় এবং কর্কের যে ছিদ্র দিয়ে কাচের নল প্রবেশ করিয়েছ সেই ছিদ্র নলের পাশ দিয়ে যেন বায়ু



পরীক্ষা 14

চলাচল করতে না পারে। আরও দেখবে নলের নীচের মুখটা যেন বোতলের জলের ভিতর ডোবানো থাকে। একটু পরেই দেখা যাবে বোতলের ভিতর বুদবুদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং নলের সরু মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত জল বাইরে বেরিয়ে আসছে (পরীক্ষা 14)।

ব্যাখ্যা ঃ বোতলের ভিতর কাপড় কাচা সোডা বা খাবার সোডার সঙ্গে লঘু অ্যাসিডের ক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হচ্ছে। ('রাসায়নিক বন্দুক' দেখ।) এই গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না, ফলে বোতলের ভিতরে গ্যাসের চাপ খুব বেড়ে যাচ্ছে। আর গ্যাসের চাপে নলের সরু মুখ দিয়ে জল ফোয়ারার মত বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে।

১৫। লোহার উপর তামার প্রলেপ !

প্রয়োজন ঃ একটি চকচকে পেরেক, একটি বিকার এবং কিছু তুঁতে (কপার সালফেট)।

পদ্ধতি ঃ তুঁতের গাঢ় দ্রবণ তৈরী করে বিকারে রাখ। এবার একটি চক্চকে পেরেককে বিকারের দ্রবণে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে পেরেকের উপর একটা লাল বর্ণের প্রলেপ পড়েছে যা তামা ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে তুঁতের সঙ্গে লোহার বিক্রিয়ায় তামা উৎপন্ন হচ্ছে এবং পেরেকের উপর তামার আবরণ পড়ছে।

$$CuSO_4 + Fe = Cu + FeSO_4$$

তুঁতে

১৬। সুগার কিউবের দানায় আগুন লাগানো

প্রয়োজন ঃ একটি সুগার কিউবের টুকরো, একটি দেশলাই বাক্স আর একটু সিগারেটের ছাই।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে বল দেশলাই কাঠি জালিয়ে সুগার কিউবের টুকরোটায় আগুন ধরাতে। কিন্তু শত চেষ্টা করলেও কেউ তা পারবে না।

কৌশল ঃ সুগার কিউবের দানার একপাশে একটু সিগারেটের ছাই ঘষে দাও। এবার দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ছাই ঘষা জায়গাটায় লাগালেই

সুগার কিউবের দানাটায় আগুন ধরে যাবে আর স্বাভাবিক ভাবেই দানাটা জলতে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ ছাই এখানে অনুঘটকের কাজ করে। ফলে সুগার কিউবের ছাই ঘষা অংশ দেশলাই কাঠির আগুনের কম উষ্ণতাতেই জ্বলে ওঠে। এতে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ফলে সমস্ত সুগার কিউবেই ধীরে ধীরে আগুন ধরে যায়। সুগার কিউব হচ্ছে বিশুদ্ধ চিনির স্ফটিক। এটা বড় স্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

১৭। আগুন ধরাও তো দেখি !

প্রয়োজন ঃ ফিটকিরি, রুমাল, কাগজ।

পদ্ধতি ঃ একটা রুমাল বা কাগজ দিয়ে বন্ধুদের বল তাতে আগুন ধরাতে—কিন্তু কেউ তা পারবে না।

কৌশল ঃ ফিটকিরির গাঢ় দ্রবণ তৈরী কর। তাতে রুমাল বা কাগজ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখ, তারপর তুলে নিয়ে শুকিয়ে নাও! আবার ডোবাও, কিছুক্ষণ পরে আবার তুলে নিয়ে শুকিয়ে রাখ। এরকম তিন চারবার করলে রুমাল বা কাগজ আর আগুনে পুড়বে না। আগে থেকেই রুমাল বা কাগজ এইভাবে প্রস্তুত করে রাখবে।

ব্যাখ্যা ঃ গরম করার ফলে ফিটকিরির অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনায় পরিণত হয়। অ্যালুমিনার অগ্নিনিরোধক ধর্ম থাকায় রুমাল পোড়ে না।

১৮। পুড়েও পোড়ে না !

প্রয়োজন ঃ একটি রুমাল, সুতো, একটা হাল্কা পুতুল, সাধারণ লবণ এবং গরম জল।

পদ্ধতি ঃ রুমালের চার কোণে চারটে সুতো বাঁধ। গরম জলে যতটা সম্ভব লবণ দ্রবীভূত করে খুব গাঢ় দ্রবণ তৈরী কর। এই দ্রবণে সুতো সহ রুমালটা ভেজাও, তুলে নিয়ে শুকিয়ে নাও। আবার ডোবাও, আবার শুকিয়ে নাও! এইভাবে বেশ কয়েকবার কর। এবার রুমালটাকে চারকোণের সুতো দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও। একটা ছোট চাঁদোয়ার মত তৈরী হল। এই

চাঁদোয়ার উপরে একটা হাল্কা পুতুল রাখ। এখন চাঁদোয়ায় আগুন ধরিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত চাঁদোয়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্বেও পুতুলসহ চাঁদোয়া পড়ে যাবে না, ঝুলতেই থাকবে।

১৯। জল দিয়ে কি আগুন জ্বালাতে পার ?

প্রয়োজন : অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, দস্তার গুঁড়ো।

পদ্ধতি : চার ভাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং এক ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আলাদা আলাদা ভাবে ভাল করে গুঁড়ো কর। এখন এই দু রকমের চূর্ণ একটা চিনামাটির প্লেটে মিশিয়ে নিয়ে তার উপর কিছু দস্তার গুঁড়ো ছড়িয়ে দাও। এবার এই মিশ্রণের উপরে একটা ড্রপারে করে সাবধানে কয়েক ফোঁটা জল ফেল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল নীল আলো সৃষ্টি হবে আর ধোঁয়ায় সব ভরে যাবে। জল দিয়েই তো আগুন নেভায় কিন্তু এখানে জল দিয়েই আগুন জ্বালানো হল। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

ব্যাখ্যা : এখানে রাসায়নিক ক্রিয়ায় দস্তার জটিল যৌগিক তৈরি হওয়ার ফলে আগুন জ্বলে ওঠে। কিছুটা দস্তা জিঙ্ক-অক্সাইডেও পরিণত হয়।

২০। গরম করলেই রঙ অদৃশ্য !

প্রয়োজন : লিকার অ্যামোনিয়া, ফেনলথেলিন ও একটি বিকার।

পদ্ধতি : বিকারে অনেকটা জল নিয়ে তাতে অল্প একটু লিকার অ্যামোনিয়া মিশিয়ে নাও। এর মধ্যে একটু ফেনলথেলিন দিলেই গোলাপী রঙ হয়ে যাবে। এবার বিকারের জল গরম করতে থাক। কিছুক্ষণ পরে দেখবে গোলাপী রং অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা : লিকার অ্যামোনিয়া হল জলে অ্যামোনিয়া গ্যাসের গাঢ় দ্রবণ। ফেনলথেলিনের সংস্পর্শে এই দ্রবণ গোলাপী রঙ ধারণ করে। গরম করলে আর অ্যামোনিয়া জলে দ্রবীভূত থাকতে না পেরে বাতাসে মিশে যায়। জলে অ্যামোনিয়া না থাকাতে গোলাপী রঙও নষ্ট হয়ে যায়, কারণ ফেনলথেলিন দ্রবণ বর্ণহীন। জলে ফেনলথেলিন খুব সামান্য দ্রবীভূত হয় বলে প্রয়োজন হলে রেক্টিফাইড স্পিরিটে ফেনলথেলিন দ্রবণ তৈরি করে তা লিকার অ্যামোনিয়াতে মেশাবে।

২১। গরম করলেই তলানী অদৃশ্য !

প্রয়োজন ঃ লেড ক্লোরাইড ও একটি টেস্ট টিউব।

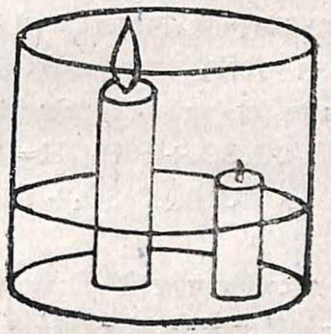
পদ্ধতি ঃ টেস্ট টিউবে একটু জল নিয়ে তাতে কিছু লেড ক্লোরাইড মেশাও। লেড ক্লোরাইড নীচে পড়ে থাকবে। এবার টেস্ট টিউবটাকে গরম কর। সবাই দেখবে লেড ক্লোরাইডের তলানী অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ লেড ক্লোরাইড ঠাণ্ডা জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু গরম জলে দ্রবণীয়। সেইজন্য গরম করলে লেড ক্লোরাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

২২। বাতি নিভে গেল কেন ?

প্রয়োজন ঃ কাপড় কাচা সোডা, ভিনিগার বা যে কোন লঘু অ্যাসিড, দুটো মোমবাতি ও একটি বড় কাচের বা প্লাস্টিকের পাত্র।

পদ্ধতি ঃ বড় কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্রে দুটো মোম বসিয়ে জ্বালিয়ে দাও। মোম দুটোর একটা লম্বায় ছোট আর একটা বড় হওয়া চাই। পাত্রে কিছু লঘু অ্যাসিড বা ভিনিগার ঢেলে তাতে কতকটা কাপড় কাচার সোডা মিশিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বুদ্‌বুদ উঠতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে ছোট মোমটা নিভে যাবে আরও কতক্ষণ পর বড় মোমটাও নিভে যাবে। (পরীক্ষা 22)



পরীক্ষা 22

ব্যাখ্যা ঃ এখানে অ্যাসিড আর সোডার ক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী বলে পাত্রের তলায় জমে থাকছে আর আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড দহনের সহায়ক নয়। সেইজন্য অক্সিজেনের অভাবে প্রথমে ছোট বাতিটা নিভে যাচ্ছে, পরে যখন গ্যাস উপরে উঠছে তখন বড় মোমটাও নিভে যাচ্ছে।

২৩। রঙ বদলায়!

প্রয়োজন ঃ লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ, ফেনলথেলিন দ্রবণ, লেড নাইট্রেটের গাঢ় দ্রবণ, তুঁতের অতি লঘু দ্রবণ ও ফেরিক সালফেট দ্রবণ।

পদ্ধতি ঃ পরপর চারটি বিকারে ফেনলথেলিন দ্রবণ, লেড নাইট্রেট দ্রবণ, তুঁতের অতি লঘু দ্রবণ এবং ফেরিক সালফেট দ্রবণ রাখ। এরপর একটি বোতল থেকে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ পরপর ওই চারিটি বিকারে ঢাল। আগে চারিটি বিকারের জলই মোটামুটি বর্ণহীন ছিল, কিন্তু ঢালার পর বিকারগুলির জল যথাক্রমে গোলাপী, সাদা, গাঢ় নীল এবং বাদামী হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ফেনলথেলিন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংস্পর্শে গোলাপী বর্ণ ধারণ করে।

লেড নাইট্রেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাদা রঙের অদ্রবণীয় লেড হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$Pb(NO_3)_2 + 2NH_4OH = Pb(OH)_2 + 2NH_4NO_3$$

লেড নাইট্রেট — লেড হাইড্রোক্সাইড

অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে তুঁতে বা কপার সালফেটের বিক্রিয়ায় প্রথমে সবুজাভ নীল রঙের একটি বেসিক লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই বেসিক লবণ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে ক্রিয়া করে গাঢ় নীল রঙের জটিল টেট্রা-অ্যামাইন কিউপ্রিক সালফেট উৎপন্ন করে।

$$2CuSO_4 + 2NH_4OH = (NH_4)_2SO_4 + Cu(OH)_2, CuSO_4$$

$$Cu(OH)_2, CuSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 6NH_3 = 2[Cu(NH_3)_4]SO_4 + 2H_2O$$

ফেরিক সালফেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় লালচে বাদামী বর্ণের ফেরিক হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$Fe_2(SO_4)_3 + 6NH_4OH_4 = 2Fe(OH)_3 + 3(NH_4)_2SO_4$$

ফেরিক সালফেট — ফেরিক হাইড্রোক্সাইড

২৪। চিনি থেকে কালো ফেনা!

প্রয়োগ ঃ একটি বিকার, চিনি এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি ঃ বিকারে একটু চিনির গাঢ় দ্রবণ নাও, এবার একটা বোতল থেকে বিকারে সমায়তন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সাবধানে একটু একটু করে

ঢাল। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করবে চিনির দ্রবণটা ফুলে ফেঁপে তা থেকে একটা কালো ফেনার মত বার হচ্ছে। প্রয়োজন হলে মিশ্রণটা একটা কাচ দণ্ড দিয়ে নাড়বে।

ব্যাখ্যা ঃ চিনির সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে কালো কার্বন উৎপন্ন হয়। কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের জলের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকায় তা বিভিন্ন যৌগিক থেকে জলের অণু বার করে আনে।

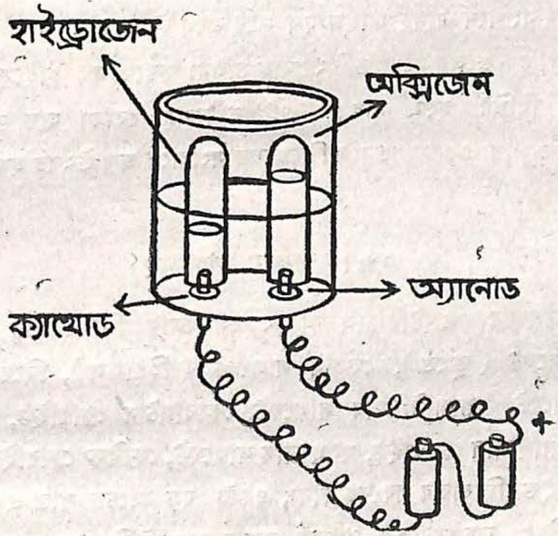
$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 = 12C + 11H_2O + H_2SO_4$$

চিনি

২৫। জল থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন !

প্রয়োজন ঃ একটা প্লাস্টিকের পাত্র, দুটো টেস্ট টিউব, টর্চের দুটো ব্যাটারি, টর্চের দুটো পুরানো ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক তার, জল, সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং গালা।

পদ্ধতি ঃ প্লাস্টিকের পাত্রটার তলায় দুটো ছিদ্র কর। পুরনো ব্যাটারি দুটো ভেঙে তা থেকে কার্বন দণ্ড দুটো বার করে নাও। এই দণ্ড দুটো পাত্রের



পরীক্ষা 25

তলার ছিদ্রে ঢুকিয়ে গালা দিয়ে আটকে দাও। এবার দুটো টর্চের ভাল ব্যাটারি নিয়ে তাদের ঠিক ছবির মত করে পরস্পরের সঙ্গে এবং কার্বন দুটোর

২৩। রঙ বদলায় !

প্রয়োজন ঃ লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ, ফেনলথেলিন দ্রবণ, লেড নাইট্রেটের গাঢ় দ্রবণ, তুঁতের অতি লঘু দ্রবণ ও ফেরিক সালফেট দ্রবণ।

পদ্ধতি ঃ পরপর চারটি বিকারে ফেনলথেলিন দ্রবণ, লেড নাইট্রেট দ্রবণ, তুঁতের অতি লঘু দ্রবণ এবং ফেরিক সালফেট দ্রবণ রাখ। এরপর একটি বোতল থেকে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ পরপর ওই চারিটি বিকারে ঢাল। আগে চারিটি বিকারের জলই মোটামুটি বর্ণহীন ছিল, কিন্তু ঢালার পর বিকারগুলির জল যথাক্রমে গোলাপী, সাদা, গাঢ় নীল এবং বাদামী হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ফেনলথেলিন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংস্পর্শে গোলাপী বর্ণ ধারণ করে।

লেড নাইট্রেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাদা রঙের অদ্রবণীয় লেড হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{লেড নাইট্রেট}}{Pb(NO_3)_2} + 2NH_4OH = \underset{\text{লেড হাইড্রোক্সাইড}}{Pb(OH)_2} + 2NH_4NO_3$$

অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে তুঁতে বা কপার সালফেটের বিক্রিয়ায় প্রথমে সবুজাভ নীল রঙের একটি বেসিক লবণ অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই বেসিক লবণ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে ক্রিয়া করে গাঢ় নীল রঙের জটিল টেট্রা-অ্যামাইন কিউপ্রিক সালফেট উৎপন্ন করে।

$$2CuSO_4 + 2NH_4OH = (NH_4)_2SO_4 + Cu(OH)_2, CuSO_4$$

$$Cu(OH)_2, CuSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 6NH_3$$
$$= 2[Cu(NH_3)_4]SO_4 + 2H_2O$$

ফেরিক সালফেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় লালচে বাদামী বর্ণের ফেরিক হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$\underset{\text{ফেরিক সালফেট}}{Fe_2(SO_4)_3} + 6NH_4OH_4 = \underset{\text{ফেরিক হাইড্রোক্সাইড}}{2Fe(OH)_3} + 3(NH_4)_2SO_4$$

২৪। চিনি থেকে কালো ফেনা !

প্রয়োগ ঃ একটি বিকার, চিনি এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি ঃ বিকারে একটু চিনির গাঢ় দ্রবণ নাও, এবার একটা বোতল থেকে বিকারে সমায়তন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সাবধানে একটু একটু করে

ঢাল। সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করবে চিনির দ্রবণটা ফুলে ফেঁপে তা থেকে একটা কালো ফেনার মত বার হচ্ছে। প্রয়োজন হলে মিশ্রণটা একটা কাচ দণ্ড দিয়ে নাড়বে।

ব্যাখ্যা : চিনির সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে কালো কার্বন উৎপন্ন হয়। কারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের জলের প্রতি তীব্র আকর্ষণ থাকায় তা বিভিন্ন যৌগিক থেকে জলের অণু বার করে আনে।

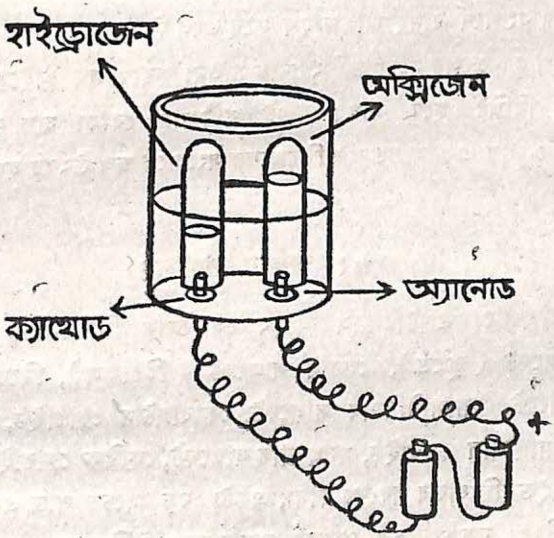
$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 = 12C + 11H_2O + H_2SO_4$$

চিনি

২৫। জল থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন !

প্রয়োজন : একটা প্লাস্টিকের পাত্র, দুটো টেস্ট টিউব, টর্চের দুটো ব্যাটারি, টর্চের দুটো পুরানো ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক তার, জল, সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং গালা।

পদ্ধতি : প্লাস্টিকের পাত্রটার তলায় দুটো ছিদ্র কর। পুরনো ব্যাটারি দুটো ভেঙে তা থেকে কার্বন দণ্ড দুটো বার করে নাও। এই দণ্ড দুটো পাত্রের



পরীক্ষা 25

তলার ছিদ্রে ঢুকিয়ে গালা দিয়ে আটকে দাও। এবার দুটো টর্চের ভাল ব্যাটারি নিয়ে তাদের ঠিক ছবির মত করে পরস্পরের সঙ্গে এবং কার্বন দুটোর

সঙ্গে যোগ কর। পাত্র অর্ধেক জলপূর্ণ করে তাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশাও। দেখবে জলের মধ্যে কার্বন দণ্ড দুটোর গা দিয়ে গ্যাসের গুঁড়িগুঁড়ি বুদবুদ উঠছে। এখন দুটো টেস্ট টিউব সম্পূর্ণরূপে জলে ভর্তি করে বুড়ো আঙুল দিয়ে মুখ বন্ধ করে পাত্রের জলের মধ্যে কার্বন দণ্ড দুটোর উপর বসিয়ে দিয়ে আঙুল সরিয়ে নাও। টেস্ট টিউব দুটোর মধ্যে ধীরে ধীরে গ্যাস জমা হবে। লক্ষ্য করলে দেখবে ক্যাথোডের (অর্থাৎ যে কার্বন দণ্ডের সঙ্গে ব্যাটারির তলার দস্তার আবরণ যোগ করা হয়েছে) টেস্ট টিউবের গ্যাসের আয়তন অন্য কার্বন দণ্ড বা অ্যানোডের উপরের টেস্ট টিউবের গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ। ক্যাথোডের টেস্ট টিউবের গ্যাস হাইড্রোজেন আর অ্যানোডের গ্যাস অক্সিজেন (পরীক্ষা 25)।

ক্যাথোডের টেস্ট টিউব গ্যাসে পূর্ণ হলে বার করে নিয়ে এসে তার মুখে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধর। হাইড্রোজেন নীল শিখায় জ্বলতে থাকবে। হাইড্রোজেনের সঙ্গে বাতাস মিশে গেলে আগুন ধরালে সামান্য বিস্ফোরণ ঘটবে। এই ব্যাপারে সাবধান থাকবে।

অ্যানোডের অক্সিজেনপূর্ণ টেস্ট টিউবের মুখে শিখাহীন জ্বলন্ত কাগজ ধরলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসেই কাগজ দপ করে জ্বলে উঠবে।

ব্যাখ্যা ঃ জলের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই পরীক্ষায় বোঝা যায় দুই আয়তন হাইড্রোজেন আর এক আয়তন অক্সিজেনের সংযোগে জল উৎপন্ন হয়।

২৬। মজার বাগান!

প্রয়োজন ঃ ওয়াটার গ্লাস অর্থাৎ সোডিয়াম সিলিকেটের গাঢ় দ্রবণ, কপার সালফেট (তুঁতে), ফেরাস সালফেট (হিরাকস), নিকেল সালফেট, জিঙ্ক সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, কোবালটাস ক্লোরাইড, কোবালটাস নাইট্রেট, ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানাস সালফেট, ফেরিক ক্লোরাইড, ক্রোমিক ক্লোরাইড ইত্যাদি ধাতব লবণের দানা, একটা বড় কাচের পাত্র এবং বালি।

পদ্ধতি ঃ বড় কাচের পাত্রের তলায় আধ ইঞ্চি পুরু এক স্তর মোটা বালি রাখ। একটা কাচের পাত্রে ওয়াটার গ্লাসের সঙ্গে সমপরিমাণ জল মেশাও। এই মিশ্রণ বড় কাচের পাত্রের বালির উপরে একটু একটু করে ঢাল। এবার পাত্রের মিশ্রণের মধ্যে বিভিন্ন ধাতব লবণের দানা ধীরে ধীরে ছেড়ে দাও।

দানাগুলোর ব্যাস যেন কমপক্ষে চার-পাঁচ মিলিমিটার হয়। বিভিন্ন রঙের দানাগুলো এমনভাবে সাজিয়ে পাত্রে ফেল যেন দেখতে আকর্ষণীয় হয়। এখন কাচের পাত্রটি এক জায়গায় স্থিরভাবে রেখে দাও।

দেখবে লবণের দানাগুলো ধীরে ধীরে ভিন্ন ভিন্ন রঙের গাছের মতন বাড়তে স্বরু করেছে। তিন চার ঘণ্টার মধ্যে এভাবে একটা নানা রঙের অপূর্ব সুন্দর চমৎকার বাগান তৈরি হবে। ওয়াটার গ্লাস আর জলের মিশ্রণে যেন বড় কাচের পাত্রটা প্রায় ভর্তি থাকে তাহলে পাত্রের মাথা পর্যন্ত গাছগুলো বাড়তে পারবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই গাছ তৈরি একটা জটিল ভৌত রাসায়নিক পদ্ধতি।

যে কোন একটা দানা (মনে কর তুঁতের দানা) জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে তুঁতের একটা গাঢ় দ্রবণ তৈরি করে। এবার তুঁতের দ্রবণের সঙ্গে সোডিয়াম সিলিকেট দ্রবণের বিক্রিয়ায় অদ্রবণীয় কপার সিলিকেট উৎপন্ন হয়। এই কপার সিলিকেট একটা পর্দার মত তুঁতের দ্রবণকে ঢেকে রাখে।

এখন বাইরের জল এই পর্দার ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে পর্দার ভিতরে জলের চাপ বেশী হওয়ায় পর্দা কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে যায়।

এইসব ছিদ্র দিয়ে তুঁতের দ্রবণ পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে একটু দূরে কপার সিলিকেটের নতুন পর্দা সৃষ্টি হয়। আগের মতই জলের চাপে এই নতুন পর্দা ছিঁড়ে গিয়ে একটু উপরে আরেকটা পর্দা তৈরী হয়। এইভাবে একটা গাছের মত সৃষ্টি হয়। জলের চাপ পাত্রের পাশের দিকের চেয়ে উপরে কম বলে গাছগুলো উপরের দিকেই বাড়তে থাকে।

এই রাসায়নিক বাগান দীর্ঘদিন এইভাবেই থেকে যায়।

২৭। আবহাওয়ার পূর্বাভাস

প্রয়োজন ঃ কাগজ, রঙ, তুলি এবং কোবাল্ট (কোবালটাস) ক্লোরাইড।

পদ্ধতি ঃ একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁক। আকাশের অংশটা গাঢ় কোবাল্ট ক্লোরাইডের দ্রবণের সাহায্যে আঁক, অন্য সব কিছু সাধারণ রঙ ব্যবহার করে আঁক।

যখন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে তখন ঃছবির আকাশের রঙ হবে নীল, যেন মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। আর মেঘলা দিনে ছবির আকাশের রঙ হবে হালকা গোলাপী, যেন আকাশে মেঘ করেছে।

ব্যাখ্যা ঃ কোবাল্ট ক্লোরাইড দু রকম হয়—অনার্দ্র, $CoCl_2$ রঙ নীল আর সোদক $CoCl_2, 6H_2O$ রঙ লাল। আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে $CoCl_2$ উৎপন্ন হয় ফলে ছবির আকাশের রঙ নীল হয়ে যায়। আবার মেঘলা আবহাওয়ায় বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়ার ফলে $CoCl_2, 6H_2O$ উৎপন্ন হয়, তখন ছবির আকাশের রঙ হয় গোলাপী।

২৮। ঘরের ভিতর মেঘ!

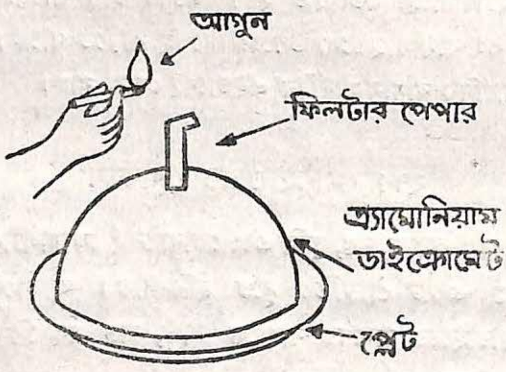
প্রয়োজন ঃ মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেট এবং একটি লোহার তার।

পদ্ধতি ঃ একটি চিনামাটির প্লেটে মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেটটা রাখ। লোহার তারের একদিক কাপড়ে জড়িয়ে ধরে অন্যদিক আগুনে গরম কর। এবার তারের উত্তপ্ত দিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেটের সঙ্গে ছোঁয়াও, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মত ধোঁয়া উৎপন্ন হয়ে ঘরের উপরে ভাসতে থাকবে।

ব্যাখ্যা ঃ মেথিলেটেড স্পিরিট ট্যাবলেটের দহনের ফলে এখানে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়।

২৯। মজার অগ্ন্যুৎপাত!

প্রয়োজন ঃ অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট, স্পিরিট, ফিল্টার কাগজ এবং একটি চিনামাটির প্লেট।



পরীক্ষা 29

পদ্ধতি ঃ অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটকে প্লেটের উপরে স্তূপাকারে রাখ। ফিল্টার কাগজকে স্পিরিটে ডুবিয়ে অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটের স্তূপের

মাঝখানে ঢুকিয়ে দাও। এবার ফিল্টার কাগজে আগুন ধরিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটের স্তূপের ভিতর থেকে লাল অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হবে। অন্ধকার ঘরে এটা দেখতে ভাল লাগে (পরীক্ষা 29)।

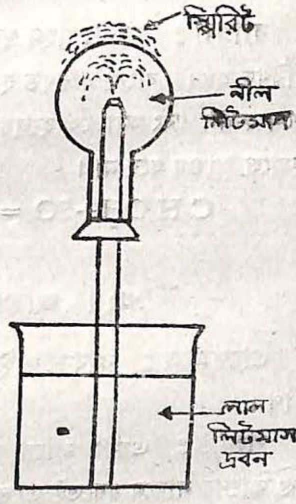
ব্যাখ্যা : অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটে আগুন দেবার ফলে তীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়, ফলে মনে হয় অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে।

$$(NH_4)_2\ Cr_2O_7 = Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$$

৩০। রাসায়নিক ফোয়ারা !

প্রয়োজন : অ্যামোনিয়া বা সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসে সম্পূর্ণ ভর্তি একটি গোলতল ফ্লাস্ক ও তার ছিপি, একটি বিকার, একটি এক মুখ সরু (ড্রপারের মত) কাচের নল, লাল লিটমাস দ্রবণ এবং একটু স্পিরিট।

পদ্ধতি : একটি ছিপিতে ছিদ্র করে কাচের নলটি ঢুকিয়ে দাও। এই ছিপি দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস ভর্তি গোলতল ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ কর। নলের সরু মুখটা ফ্লাস্কের ভিতর থাকবে। বিকারে লাল লিটমাস দ্রবণ নিয়ে নলের অন্য মুখটা বিকারের দ্রবণে ডুবিয়ে দাও। ফ্লাস্কের উপরে একটু স্পিরিট ঢাল। সবাই দেখবে নীচের লাল জল ফোয়ারার মত উপরের ফ্লাস্কে উঠছে আর উপরে উঠেই নীল রঙ ধারন করছে। (পরীক্ষা 30)



পরীক্ষা 30

ব্যাখ্যা : স্পিরিট ঢাললে স্পিরিটের দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে ফ্লাস্ক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এতে ফ্লাস্কের ভিতরের অ্যামোনিয়া আয়তনে সঙ্কুচিত হয় আর তার চাপ কমে যায়। ফলে বাইরের বাতাসের চাপে বিকার থেকে কিছু জল ফ্লাস্কে প্রবেশ করে। অ্যামোনিয়া অতিমাত্রায় জলে দ্রবণীয়, ফলে অনেকটা অ্যামোনিয়া এই জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তখন ফ্লাস্কের অ্যামোনিয়ার চাপ অনেক কমে যায় আর নীচের বিকার থেকে ফোয়ারার

মত লাল লিটমাস দ্রবণ উপরের ফ্লাস্কে প্রবেশ করে। এখন অ্যামোনিয়া হল ক্ষারধর্মী, ফলে লাল লিটমাস দ্রবণ অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে নীল রঙ ধারণ করে।

ফ্লাস্কে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকলে বিকারে নিতে হবে নীল লিটমাস দ্রবণ। সালফার ডাই অক্সাইড অম্লধর্মী গ্যাস বলে নীল লিটমাসকে লাল করবে।

৩১। আগুনেও রুমাল পোড়ে না!

প্রয়োজন : ইথাইল অ্যালকোহল ও একটি সুতীর রুমাল।

পদ্ধতি : অ্যালকোহলের সঙ্গে তার ছয় গুণ জল মেশাও। টেবিলের উপর একটা রুমাল রেখে এই মিশ্রণটা তাতে ঢেলে দাও। এবার মিশ্রণে আগুন ধরিয়ে দাও। মিশ্রণে আগুন জলে উঠবে। কিন্তু সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখবে রুমালের উপর আগুন জলতে থাকলেও সেই আগুনে রুমাল পুড়ে যাচ্ছে না! সুতি ছাড়া অন্য কাপড়ের রুমাল নেবে না।

ব্যাখ্যা : অ্যালকোহল খুব উদ্বায়ী অর্থাৎ এটা অতি তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ চলে যাওয়ার ফলে রুমাল এবং অ্যালকোহলের কিছু অংশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। সেই জন্যই রুমালে আগুন ধরে না।

$$C_2H_5OH+3O_2=2CO_2+3H_2O$$

৩২। আগুন জ্বলে উঠল কেন?

প্রয়োজন : কার্বন ডাই-সালফাইড, একটা লম্বা কাচের দণ্ড ও একটা কাপ।

পদ্ধতি : একটা কাপে কিছুটা তরল পদার্থ রয়েছে। একটা কাচের দণ্ড কাপের সামনে ধরতেই তরল পদার্থটা দপ করে জলে উঠল।

কৌশল : কাপে রাখবে কার্বন ডাই-সালফাইড, আর কাচের দণ্ডের একটা প্রান্ত আগে থেকেই গরম করে রাখবে, কেউ যেন বুঝতে না পারে। এবার দণ্ডের উত্তপ্ত দিকটা কার্বন ডাই-সালফাইডের কাছে নিয়ে গেলেই ওটা জলে উঠবে।

ব্যাখ্যা ঃ কার্বন ডাই সালফাইডের জ্বলনাঙ্ক খুব কম। সেই জন্য গরম কাচ দণ্ডের কাছে এলেই সেটা জ্বলে ওঠে।

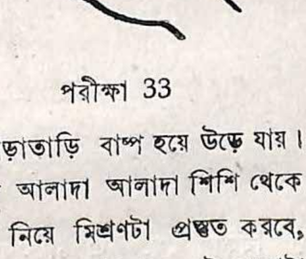
কার্বন ডাই-সালফাইড অত্যন্ত সহজদাহ্য বলে এটাকে কোন উত্তপ্ত জিনিষ বা অগ্নিশিখা থেকে সবসময় অন্তত দু-মিটার দূরে রাখবে।

৩৩। যেই আগুনে হাতও পোড়ে না!

প্রয়োজন ঃ কার্বন ডাই-সালফাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও একটি রুমাল।

পদ্ধতি ঃ দশ মিলিলিটার কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এবং পনেরো মিলিলিটার কার্বন ডাই-সালফাইডের একটি মিশ্রণ প্রস্তুত কর। হাতের উপর একটা বড় রুমাল দু-ভাঁজ করে রেখে তার উপর এই মিশ্রণটা ঢেলে দাও। এবার এই মিশ্রণে আগুন ধরিয়ে দিলে মিশ্রণটা শিখাসহ অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকবে। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখবে, কি আশ্চর্য ব্যাপার, মিশ্রণ জ্বলতে থাকলেও রুমাল বা হাতের কিছুই হল না বা পুড়ে গেল না! (পরীক্ষা 33)।

ব্যাখ্যা ঃ এই মিশ্রণটা খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ হাত ও রুমাল থেকে সংগ্রহ করার ফলে আগুন জ্বলা সত্ত্বেও হাত ও রুমাল ঠাণ্ডা থাকে। এর জন্য হাত বা রুমাল পুড়ে যায় না।



পরীক্ষা 33

এই দুটো তরল অত্যন্ত উদ্বায়ী বলে খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সেই জন্য এই পরীক্ষাটা দেখাবার ঠিক আগে আলাদা আলাদা শিশি থেকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও কার্বন ডাই-সালফাইড নিয়ে মিশ্রণটা প্রস্তুত করবে, আগে থেকে মিশ্রণ তৈরি করে রাখবে না। আর খুব সাবধানে এই খেলাটা দেখাবে।

আরও মনে রাখবে এই তরল দুটো খুব বিষাক্ত।

কয়েকবার অভ্যাস করলে রুমাল না নিয়ে শুধু হাতেও এই খেলাটা

দেখানো যায়। এটা দেখানোর সময় ঘরের দরজা জানালা সব খোলা রাখবে যাতে সব বিষাক্ত গ্যাস ঘরের বাইরে চলে যেতে পারে।

কার্বণ টেট্রাক্লোরাইড অদাহ্য, এখানে শুধু কার্বন ডাই-সালফাইডেরই দহন হয়।

$$CS_2+3O_2=CO_2+2SO_2$$

৩৪। সাপ! সাপ!

প্রয়োজন: প্যারা-নাইট্রো-অ্যাসেটানিলাইড, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও একটা বিকার।

পদ্ধতি: বিকারে প্যারা-নাইট্রো-অ্যাসেটানিলাইড রেখে তাতে একটু গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। এবার বিকারটা গরম কর। কিছুক্ষণ

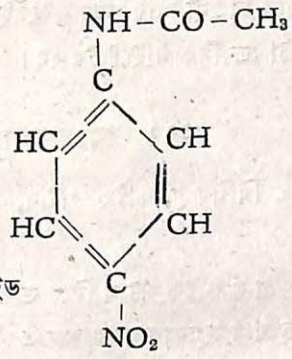


পরীক্ষা 34

পরে বিকার থেকে একটা লম্বা কালো সাপের মত এঁকে বেঁকে বেরিয়ে আসবে আর ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে যাবে। এই খেলাটা সাবধানে দেখাবে (পরীক্ষা 34)।

ব্যাখ্যা: গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড প্যারো-নাইট্রো-অ্যাসেটানিলাইডকে কালো কার্বনে পরিণত করে। এই কার্বনই কালো সাপের আকারে বিকার

থেকে বেরিয়ে আসে। এর সঙ্গে কিছু সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসও উৎপন্ন হয়।



প্যারা-নাইট্রো অ্যাসেটানিলাইড
p-Nitroacetanilide

৩৫। জল ঢেলে আগুন !

প্রয়োজন ঃ ক্রোমিয়াম ট্রাই-অক্সাইড (ক্রোমিক অ্যানহাইড্রাইড), ইথাইল অ্যালকোহল এবং একটি বড় চিনামাটির প্লেট।

পদ্ধতি ঃ চিনামাটির প্লেটে কয়েকটা লাল বর্ণের কঠিন পদার্থের দানা রাখা আছে। একটা বিকার থেকে তার উপর একটু জল ঢালতেই দাউ দাউ করে সবটা জ্বলে উঠল।

কৌশল ঃ চিনামাটির প্লেটে আছে ক্রোমিয়াম ট্রাই-অক্সাইড। বিকারে কিন্তু জল নেই। আছে অ্যালকোহল। বিকারের অ্যালকোহল আগে থেকেই সামান্য গরম করে রাখবে। সামান্য একটু অ্যালকোহল ক্রোমিয়াম ট্রাই-অক্সাইডের উপর ঢাললেই তাতে আগুন ধরে যাবে। খুব সতর্কভাবে এই খেলাটা দেখাবে। মনে রাখবে ক্রোমিয়াম ট্রাই-অক্সাইড অতি বিষাক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ ক্রোমিয়াম ট্রাই-অক্সাইড (CrO_3) তীব্র জারক। এটা অ্যালকোহলকে (C_2H_5OH) জারিত করছে বলেই অ্যালকোহলে আগুন ধরে যাচ্ছে।

$$4CrO_3 + C_2H_5OH = 2Cr_2O_3 + 3H_2O + 2CO_2$$

ক্রোমিক অক্সাইড

৩৬। ঠাণ্ডায় এক রঙ গরমে আর এক রঙ !

প্রয়োজন ঃ ক্রোমিক নাইট্রেট ও একটি বিকার।

পদ্ধতি ঃ বিকারে ক্রোমিক নাইট্রেটের দ্রবণ তৈরি কর। দ্রবণের রঙ হবে বেগুনী। দ্রবণকে গরম কর, রঙ হয়ে যাবে সবুজ। এভাবে দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলেই রং হবে বেগুনী আর গরম করলেই রং পরিণত হবে সবুজে।

ব্যাখ্যা ঃ এটা ক্রোমিক নাইট্রেটের ধর্ম।

৩৭। রঙের মজা !

প্রয়োজন ঃ মেথিলিন ব্লু, কষ্টিক পটাস, গ্ল,কোজ এবং একটি বড় ফ্লাস্ক ও তার ছিপি।

পদ্ধতি ঃ চার গ্রাম কষ্টিক পটাস নিয়ে তার একটা অতি লঘু দ্রবণ তৈরি কর। এই দ্রবণে দু গ্রাম গ্ল,কোজ আর অল্প একটু মেথিলিন ব্লু মিশিয়ে নাও। বড় ফ্লাস্কে মিশ্রণটা রেখে ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে দাও। মিশ্রণটা হবে বর্ণহীন। ফ্লাস্কটা এবার জোরে একবার ঝাঁকাও। সকলে দেখতে পাবে বর্ণহীন তরল পদার্থ টা ঝাঁকাতেই গাঢ় নীল বর্ণের হয়ে গেল। আবার কি মজা, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার রঙ পাল্টে হয়ে গেল গোলাপী। আরও কিছুক্ষণ পরে গোলাপী রঙও মিলিয়ে গিয়ে তরলটা হয়ে গেল বর্ণহীন।

ব্যাখ্যা ঃ দ্রবণের নীল রঙ হয় মেথিলিন ব্লুএর জন্য, পরে গ্ল,কোজ কষ্টিক পটাসের উপস্থিতিতে মেথিলিন ব্লুকে বিজারিত করে, ফলে দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে যায়।

৩৮। মজার জেব্রা !

প্রয়োজন ঃ অ্যান্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইড দ্রবণ, লেড অ্যাসেটেট দ্রবণ এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস।

পদ্ধতি ঃ সাদা কাগজে একটা জেব্রার ছবি আঁক। জেব্রার গায়ের ডোরা কাটা দাগগুলোতে একটা তুলির সাহায্যে গাঢ় অ্যান্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইড দ্রবণ বুলিয়ে দাও। গায়ের বাকি অংশে বোলাও গাঢ় লেড অ্যাসেটেট দ্রবণ। ছবিটা সাদাই থাকবে। এখন ছবিটাকে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসে ধর। দেখবে জেব্রার গায়ের ডোরা কাটা দাগগুলো কমলা রঙের আর বাকি অংশ কালো রঙের হয়ে গেছে। ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন, সালফাইড গ্যাস পাওয়া যাবে। এই গ্যাস যেন বেশী পরিমাণে শরীরে না যায়।

ব্যাখ্যা ঃ অ্যান্টিমনি ট্রাই-ক্লোরাইডের ($SbCl_3$) সঙ্গে হাইড্রোজেন সালফাইডের (H_2S) বিক্রিয়ায় কমলা রঙের অদ্রবণীয় অ্যান্টিমনি ট্রাই-সালফাইড উৎপন্ন হয়।

$$2SbCl_3+3H_2S=Sb_2S_3+6HCl$$

আর লেড অ্যাসেটেটের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে কালো বর্ণের অদ্রবণীয় লেড সালফাইড।

$$Pb(CH_3COO)_2+H_2S=PbS+2CH_3COOH$$

৩৯। মজার ছবি !

প্রয়োজন ঃ কোবাল্টাস ক্লোরাইড এবং নিকেল ক্লোরাইড অথবা কোবাল্টাস অ্যাসেটেট।

পদ্ধতি ঃ একটা মানুষের মুখ বা একটা ফুলগাছের ছবি আঁক সাদা কাগজে। মুখ বা ফুলে নিকেল ক্লোরাইডের দ্রবণ তুলির দ্বারা বুলিয়ে দাও। চুল আর গাছের অন্য অংশে বোলাও কোবাল্ট ক্লোরাইডের দ্রবণ। ছবিটা সাদাই থাকবে। এবার ছবিটাকে সাবধানে গরম কর যেন পুড়ে না যায়। দেখবে মুখ আর ফুলের রঙ হয়ে গেছে সোনালি এবং চুল ও গাছের বাকি অংশের রঙ হয়ে পড়েছে নীল।

ব্যাখ্যা ঃ 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস' দেখ। সোদক নিকেল ক্লোরাইডের বর্ণ সবুজ আর অনার্দ্র নিকেল ক্লোরাইডের রং সোনালি। গরম করলে সোদক নিকেল ক্লোরাইড অনার্দ্র হয়ে পড়ে ফলে ছবির মুখ ও ফুলের রঙ সোনালি হয়ে যায়।

$$NiCl_2,\ 6H_2O=NiCl_2+6H_2O$$

নিকেল ক্লোরাইড দ্রবণের বদলে কোবাল্টাস অ্যাসেটেট দ্রবণও ব্যবহার করতে পার। এই ক্ষেত্রে গরম করলে মুখ ও ফুলের রঙ হবে বেগুনী।

৪০। রঙের খেলা !

প্রয়োজন ঃ টিংচার আয়োডিন, ভাতের ফেন আর একটি টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি ঃ টেস্ট টিউবে একটু ফেন দাও। এক ফোঁটা টিংচার আয়োডিন টেস্ট টিউবে ফেলে নেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে ফেনের রঙ হয়ে যাবে গাঢ় নীল।

এবার টেস্ট টিউবটা গরম কর। নীল রং অদৃশ্য হয়ে যাবে কিন্তু ঠাণ্ডা করলেই নীল রং আবার ফিরে আসবে। এভাবে যতবার গরম করবে নীল রঙ অদৃশ্য হয়ে যাবে আর ঠাণ্ডা হলেই ফিরে আসবে।

ব্যাখ্যা : টিংচার আয়োডিন হল পটাসিয়াম আয়োডাইডের জলীয় দ্রবণ এবং রেকৃটিফাইড স্পিরিটে আয়োডিনের দ্রবণ। ভাতের ফেনে রয়েছে স্টার্চ। স্টার্চের সঙ্গে আয়োডিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটা নীল বর্ণের যৌগিক উৎপন্ন হয়। এই যৌগিকটির সঠিক গঠন এখনও জানা যায় নি। এই পরীক্ষাটা আয়োডিনের অতি সুবেদী পরীক্ষা। পঞ্চাশ লক্ষ ভাগ জলে মাত্র এক ভাগ আয়োডিন থাকলেও এই পরীক্ষায় আয়োডিনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

৪১। অদৃশ্য কালি-কোবাল্ট ক্লোরাইড!

প্রয়োজন : কোবাল্টাস ক্লোরাইড।

পদ্ধতি : কোবাল্ট ক্লোরাইডের দ্রবণ দিয়ে সাদা কাগজে কিছু লেখ। লেখাটা শুকিয়ে নাও। কোন কিছু লেখা আছে বলেই বোঝা যাবে না। এবার কাগজটাকে একটু গরম করলেই অবাক হয়ে দেখবে কাগজের গায়ে উজ্জ্বল রঙের লেখা ভেসে উঠেছে।

ব্যাখ্যা : 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস' দেখ। সাধারণ অবস্থায় সোদক কোবাল্ট ক্লোরাইডের গোলাপী রঙ কাগজে বোঝা যাবে না।

৪২। অদৃশ্য কালি—তুঁতে!

প্রয়োজন : তুঁতে ও স্মেলিং সল্ট।

পদ্ধতি : তুঁতের দ্রবণ দিয়ে কাগজে কিছু লিখে শুকিয়ে নাও। লেখা অদৃশ্য থাকবে। এবার স্মেলিং সল্টের শিশির ছিপি খুলে তার মুখের কাছে কাগজটা ধর। কাগজের গায়ে নীল বর্ণের অক্ষর ফুটে উঠবে।

ব্যাখ্যা : স্মেলিং সল্টের শিশি থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বার হয়। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে তুঁতের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। 'রঙ বদলায়' দেখ।

৪৩। অদৃশ্য কালি—হিরাকস!

প্রয়োজন : ফেরাস সালফেট (হিরাকস) ও পটাসিয়াম ফেরি-সায়ানাইড।

পদ্ধতি : আগের মতই ফেরাস সালফেটের দ্রবণ দিয়ে সাদা কাগজে কিছু লিখে শুকিয়ে নাও। লেখা বোঝা যাবে না। এখন পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের দ্রবণে কাগজটা ডোবাও। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের বুকে নীল বর্ণের লেখা ভেসে উঠবে।

ব্যাখ্যা : এখানে ফেরাস সালফেটের সঙ্গে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের বিক্রিয়া ঘটছে। 'জলে জল মেশালেই নীল' দেখ।

৪৪। অদৃশ্য কালি—সিলভার নাইট্রেট !

প্রয়োজন : সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ।

পদ্ধতি : লঘু সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দিয়ে কাগজে লেখ। এবার কাগজটাকে রৌদ্রে মেলে ধরলেই কাগজের বুকে কালো রঙের লেখা দৃষ্টি-গোচর হবে।

ব্যাখ্যা : সূর্যের আলোর সংস্পর্শে সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে কাগজ কাপড় ইত্যাদি জৈব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। এর ফলে সিলভার বা রূপা উৎপন্ন হয়। এই রূপা সূক্ষ্ম চূর্ণাকারে থাকে বলে একে কালো মনে হয়।

৪৫। অদৃশ্য কালি—বিসমাথ নাইট্রেট !

প্রয়োজন : বিসমাথ নাইট্রেট।

পদ্ধতি : কঠিন বিসমাথ নাইট্রেট দিয়ে রঙিন কাগজে লেখ যেমন চক দিয়ে লেখে ব্ল্যাকবোর্ডে। কোন লেখাই ফুটবে না। এবার কাগজটাকে জলে ভেজাও। অমনি লেখাগুলো ফুটে উঠবে সাদা অক্ষরে।

ব্যাখ্যা : বর্ণহীন বিসমাথ নাইট্রেটের সঙ্গে জলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাদা রঙের অদ্রবণীয় বেসিক নাইট্রেট উৎপন্ন হওয়ার ফলে লেখা ফুটে ওঠে।

$$Bi(NO_3)_3+2H_2O=Bi(OH)_2NO_3+2HNO_3$$

৪৬। তাপ দিয়ে লেখা !

প্রয়োজন : সালফিউরিক অ্যাসিড, মোটা সাদা কাগজ এবং একটি কাচের দণ্ড।

পদ্ধতি : কাচ দণ্ডের সাহায্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে সাদা

কাগজে যা খুশি লেখ। এবার সাবধানে কাগজটাকে গরম কর যেন পুড়ে না যায়। কাগজের উপরে অদৃশ্য লেখাগুলো কালো অক্ষরে ফুটে উঠবে।

ব্যাখ্যা ঃ গরম করার ফলে জল বাষ্পীভূত হওয়াতে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড গাঢ় অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ধর্ম হল তা জৈব পদার্থ থেকে জল টেনে নেয়। এখানে কাগজ থেকে জল বার করে নেওয়ার জন্য কাগজ কার্বনে পরিণত হল। ফলে লেখাটা কালো হয়ে গেল।

৪৭। আগুন জ্বালিয়ে লেখা !

প্রয়োজন ঃ পটাসিয়াম নাইট্রেট (বাজি তৈরি করার সোরা) মোটা সাদা কাগজ ও তুলি।

পদ্ধতি ঃ সোরার গাঢ় দ্রবণ তৈরি কর। এই দ্রবণে তুলি ডুবিয়ে মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে কোন কিছু লেখ। লেখাগুলো কাগজ থেকে তুলি না তুলে একবারে লিখতে হবে, যেন সব কটা অক্ষর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এবার কাগজের চারপাশটা মুড়ে একটা বাটি বা ঢাকনার মত আকার কর। অন্য এক ফালি লম্বা কাগজ নিয়ে সেটা মুড়ে এক প্রান্তে আগুন ধরাও। আগুনটা নিভিয়ে দাও তাহলে ধোঁয়া বার হতে থাকবে।

তোমার লেখাটা শুকিয়ে গেলে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এখন কাগজের বাটিটা উপুড় করে রেখে ফালি কাগজের ধোঁয়া বার হওয়া প্রান্তটা তোমার অদৃশ্য আর জড়ানো লেখার যে কোন প্রান্তে ছোঁয়াও। সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখবে লেখাটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পুড়ে কালো হয়ে গেল, কিন্তু বাকি কাগজটার কিছুই হল না। এর ফলে কাগজের মধ্যে লেখাটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

ব্যাখ্যা ঃ পটাসিয়াম নাইট্রেট একটি জারক বলে কম তাপমাত্রাতেই লেখার অংশের কাগজ পটাসিয়াম নাইট্রেটের সংস্পর্শে জারিত হয়ে পুড়ে গেল, কিন্তু বাকি কাগজ এত কম তাপমাত্রাতে পুড়ল না।

তোমরা অনেকগুলি অদৃশ্য কালির ব্যবহার শিখলে। এর সাহায্যে তোমার বন্ধুদের রাগিয়ে দিয়ে খুব মজা করতে পার। মনে কর তোমার কোন বন্ধুর নাম অয়ন। তুমি যদি অদৃশ্য কালিতে 'অয়ন আজকে স্কুলে পড়া পারে নি বলে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে ছিল' লিখে সেটা তার সামনে ফুটিয়ে তোল তাহলে দেখবে মজা কি রকম হয়!

৪৮। মজার ফেনা !

প্রয়োজন ঃ শতকরা তিন ভাগ হাইড্রোজেন পারক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড চূর্ণ, তরল ডিটারজেণ্ট এবং একটি লম্বা কাচের জার।

পদ্ধতি ঃ কাচের জারে আড়াই সেন্টিমিটার পুরু করে ৩% হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢাল। কয়েক ফোঁটা যে কোন তরল ডিটারজেণ্ট মেশাও। এবার কিছু ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড চূর্ণ জারের ভিতর ফেলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে জারের ভিতর ফেনা তৈরি হতে থাকবে। আর জারটা যদি পঁচিশ সেন্টিমিটারের চেয়ে লম্বা না হয় তবে জার ভর্তি হয়ে ফেনা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।



পরীক্ষা 48

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড অনুঘটকের কাজ করে। এর সংস্পর্শে আসার ফলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড জল আর অক্সিজেনে ভেঙে যায়। এই অক্সিজেন গ্যাস তরল সাবানের মধ্যে দিয়ে উপরে উঠবার সময় প্রচুর ফেনার সৃষ্টি করে।

$$2H_2O_2 + MnO_2 = 2H_2O + O_2 + MnO_2$$

৪৯। রেয়ন প্রস্তুত !

প্রয়োজন ঃ তুঁতে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (কষ্টিক সোডা), লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ফানেল, ফিল্টার কাগজ আর একটি এক মুখ সরু নল।

পদ্ধতি ঃ তুঁতের দ্রবণে বেশি করে কষ্টিক সোডা দ্রবণ মেশাও ; হাল্কা নীল বর্ণের অদ্রবণীয় কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে। ফিল্টার করে কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড পৃথক কর। তারপর এই কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইডে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ ঢাল, গাঢ় নীল রঙের টেট্রা—অ্যামাইন কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড, $Cu(NH_3)_4(OH)_2$ এর দ্রবণ উৎপন্ন হবে। এই দ্রবণে ফিল্টার কাগজের টুকরো ফেলে দিলে তা দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এভাবে ফিল্টার কাগজ দ্রবীভূত করতে থাক যাতে দ্রবণটা শেষ পর্যন্ত সিরাপের মত হয়।

এবার এই দ্রবণটা নলের মধ্যে ঢাল, নলের নীচে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড পূর্ণ একটি বিকার রাখ যাতে দ্রবণটা সরু সুতোর মত নলের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে পড়ে। একটু পরে এই সুতো তুলে জলে ধুয়ে ফেল। এটাই হল রেয়নের সুতো, এই ধরনের রেয়নকে বলে কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন।

৫০। আগুন কাঠি!

প্রয়োজন: পটাসিয়াম ক্লোরেট, চিনি, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, মোমবাতি এবং একটি কাচের রড।

পদ্ধতি: একটা মোমবাতির পলতেয় তুমি একটা কাচের রড ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটা জ্বলে উঠল।

কৌশল: পটাসিয়াম ক্লোরেট আর চিনি আলাদাভাবে চূর্ণ করে নাও। এই দু রকম চূর্ণ একসঙ্গে মিশিয়ে আগে থেকেই মোমবাতির পলতেয় ভাল করে লাগিয়ে রাখবে। কাচের রডের এক প্রান্ত আগে থেকেই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে তুলে রাখবে। এখন রডের অ্যাসিড লাগানো প্রান্ত পলতেয় ছোঁয়ালেই তাতে আগুন ধরে যাবে।

ব্যাখ্যা: 'বিনা তাপে আগুন' (11নং পৃষ্ঠা) দেখ।

৫১। জল দিয়ে আগুন ধরানো!

প্রয়োজন: সোডিয়াম পারক্সাইড, তুলো আর গরম জল।

পদ্ধতি: একটি চিনামাটির কাপে একটু তুলো রাখা আছে। তুলোতে একটু গরম জল ঢালতেই আগুন ধরে গেল।

কৌশল: তুলোর ভিতর কিছুটা সোডিয়াম পারক্সাইড মুড়ে নিয়ে আগে থেকেই সেটা কাপে রেখে দেবে। এখন তুলোতে দু-এক ফোঁটা গরম জল ঢাললেই তাতে আগুন ধরে যাবে।

ব্যাখ্যা: সোডিয়াম পারক্সাইডের সঙ্গে গরম জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। আর এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে অক্সিজেনের সংস্পর্শে তুলোতে আগুন ধরে যায়।

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$$

৫২। আশ্চর্য সিগারেট !

প্রয়োজন ঃ একটি সিগারেট, একটু পটাসিয়াম ধাতু আর জল।

পদ্ধতি ঃ একটি সিগারেটে এক ফোঁটা জল ফেলতেই আগুন ধরে গেল।

কৌশল ঃ আগে থেকেই সিগারেটের ভিতরে এক প্রান্তে পটাসিয়াম ধাতুর সামান্য একটু টুকরো লুকিয়ে রেখে দেবে। এবার সিগারেটের যে জায়গায় পটাসিয়ামের টুকরোটি লুকানো আছে এখানে এক ফোঁটা জল ফেললেই আগুন ধরে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ পটাসিয়ামের সঙ্গে জলের ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, আর এই বিক্রিয়ায় এত তাপ সৃষ্টি হয় যে উৎপন্ন হাইড্রোজেন জলে ওঠে। এর ফলে সিগারেটেও আগুন ধরে যায়। জল খুব কম দিতে হবে নাহলে সিগারেটের অনেকটা জায়গা ভিজে যাবে ফলে সহজে আগুন ধরবে না।

পটাসিয়ামকে সবসময় কেরোসিন তেলের ভিতর ডুবিয়ে রাখবে, আর লক্ষ্য রাখবে যাতে এটা আগুন বা জলের সংস্পর্শে না আসে। পটাসিয়াম নরম ধাতু বলে একটা ছুরি দিয়েই এই ধাতুকে কাটা যায়।

$$2K + 2H_2O = 2KOH + H_2$$

৫৩। সীসার গাছ !

প্রয়োজন ঃ লেড অ্যাসেটেট, দস্তার দণ্ড, ডিস্টিল্ড ওয়াটার আর একটি বড় কাচের পাত্র যেমন হরলিকসের শিশি।

পদ্ধতি ঃ বড় শিশিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার বা বৃষ্টির জলে লেড অ্যাসেটেট গুলে নাও। দ্রবণ পরিষ্কার নাহলে ফিল্টার করে নাও। শিশির ভিতর দস্তার দণ্ডটা ঝুলিয়ে রাখ। এবার শিশিটাকে নাড়াচাড়া না করে স্থিরভাবে কয়েক ঘণ্টা রেখে দাও। দেখবে শিশির ভিতর সুন্দর সীসার গাছ তৈরি হয়েছে আর ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ লেড অ্যাসেটেটের সঙ্গে দস্তার বিক্রিয়ায় সীসা ধাতু উৎপন্ন হয়। এই সীসা ধাতু এক বিশিষ্ট স্ফটিকাকার রূপে থাকে বলে তাকে গাছের মত মনে হয়। মনে রাখবে লেড অ্যাসেটেট খুব বিষাক্ত।

$$Pb(CH_3COO)_2 + Zn = Zn(CH_3COO)_2 + Pb$$

৫৪। রঙ কোথায় গেল ?

প্রয়োজন ঃ ব্লিচিং পাউডার, লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, লাল ফুল, সবুজ পাতা, হলুদ কাপড় আর একটি ছাপা কাগজ যাতে ছাপার উপরে সাধারণ কালি দিয়ে কিছু লেখা আছে।

পদ্ধতি ঃ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে ফুল, পাতা, কাপড় এবং ছাপা কাগজ ডোবানো হল। এবার এগুলো তুলে নিয়ে ক্রমান্বয়ে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে ডোবানো হল। দেখা গেল ফুল, পাতা আর কাপড়ের রঙ সাদা হয়ে গেল আর কাগজের উপরে কালি দিয়ে লেখাটা মুছে গেল যদিও ছাপা অক্ষরগুলো ঠিক রয়ে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। ক্লোরিন জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এই জায়মান অক্সিজেন ফুল পাতা ইত্যাদির রঙের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাদের বর্ণহীন পদার্থে পরিণত করে। ছাপার কালিতে আছে কার্বন, ক্লোরিন বা জায়মান অক্সিজেন কার্বনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না, ফলে ছাপা অক্ষরের কোন পরিবর্তন হয় না।

$$Ca(OCl)Cl + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + Cl_2$$

$$Cl_2 + H_2O = 2HCl + O$$

এর আগে 'ফুলের রঙ কোথায় গেল' (13 নম্বর পরীক্ষা) তে সালফার ডাই-অক্সাইডের বিরঞ্জক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছ। মনে রাখবে ক্লোরিনের সাহায্যে বিরঞ্জন করলে আগের রঙ কখনও ফিরে আসে না কিন্তু সালফার ডাই-অক্সাইডের দ্বারা বিরঞ্জন করলে আগের রঙ অনেক সময় ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

৫৫। ইচ্ছামত রুমালের রঙ বদল !

প্রয়োজন ঃ পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট এবং ফেরিক ক্লোরাইড।

পদ্ধতি ঃ একটা ভেজা সাদা রুমাল প্রথম বিকারের জলে রাখলে রুমালটার রঙ হয়ে গেল লাল ! এবার রুমালটাকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় বিকারের জলে ডোবালে রুমালের রঙ হয়ে পড়ল নীল !

কৌশল ঃ রুমালটাকে আগে থাকতেই ফেরিক ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণে ডুবিয়ে নিতে হবে। এছাড়া প্রথম বিকারে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের দ্রবণ এবং দ্বিতীয় বিকারে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের দ্রবণ আগে থেকেই রেখে দিতে হবে। এই দ্রবণ দুটোকে জলের মতই দেখাবে।

ব্যাখ্যা ঃ 'রক্ত রক্ত' (2 নম্বর পরীক্ষা) এবং 'জলে জল মেশালেই নীল' (7 নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

৫৬। জল থেকে দুধ, দুধ থেকে আবার জল !

প্রয়োজন ঃ চুণ (ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড) কাপড় কাচা সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি ঃ একটা বোতল থেকে কিছু জল একটি গ্লাসে ঢালতেই তা ধীরে ধীরে দুধে পরিণত হয়ে গেল! এবার এই দুধ আর একটি গ্লাসে ঢাললে তা আবার জলে পরিণত হল!

কৌশল ঃ কিছু চুণ জলে দ্রবীভূত করে তা ফিল্টার করে নাও, এখন এই পরিষ্কার চূণের জল আগে থেকেই বোতলে রেখে দিতে হবে। প্রথম গ্লাসে রাখতে হবে কয়েক ফোঁটা কাপড় কাচা সোডার গাঢ় দ্রবণ আর দ্বিতীয় গ্লাসে থাকবে কয়েক ফোঁটা গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

ব্যাখ্যা ঃ চূণের সঙ্গে সোডিয়াম কার্বনেটের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অদ্রব্য সাদা রঙের ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। এটা জলে ভেসে থাকে বলে জলকে সাদা দুধের মত মনে হয়। আবার ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় ফলে 'দুধ' আবার বর্ণহীন 'জলে' পরিণত হয়। দ্বিতীয় গ্লাসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কম থাকলে কিন্তু 'দুধের' সাদা রঙ সম্পূর্ণরূপে দূর হবে না।

$$Ca(OH)_2+Na_2CO_3=CaCO_3+2NaOH$$

$$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+CO_2+H_2O$$

৫৭। অগ্নিভক্ষণ !

প্রয়োজন ঃ কিছু রেক্টিফাইড স্পিরিট বা ইথাইল অ্যালকোহল আর কিছু ফল।

পদ্ধতি ঃ একটি প্লেটে কিছু কাটা ফল আছে। একটা দেশলাই কাঠি

জ্বালিয়ে তাতে ধরতেই ফলগুলোতে আগুন ধরে গেল। এবার তুমি একটা চামচে করে সেই ফলের টুকরোগুলো তুলে একটার পর একটা মুখে ঢুকিয়ে খেয়ে ফেললে !

কৌশল ঃ ফলের টুকরোগুলোতে আগে থেকেই সামান্য রেক্‌টিফাইড স্পিরিট বা ইথাইল অ্যালকোহল ছড়িয়ে রাখবে। এখন জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছোঁয়ালেই অ্যালকোহল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। এবার চামচে করে একটা ফলের টুকরো তুলে নিয়ে প্রশ্বাসের সাহায্যে সেটা নিভিয়ে দিয়ে খেয়ে ফেল। ফলটা সামান্য একটু গরম লাগবে মাত্র। প্রথম প্রথম কয়েকবার সাবধানে অভ্যাস করবে।

ব্যাখ্যাঃ অ্যালকোহল খুব উদ্বায়ী অর্থাৎ অতি শীঘ্র বাষ্পীভূত হয়ে যায়। আর বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ চার পাশের বস্তু থেকে সংগ্রহ করে। ফলে অ্যালকোহলের দহনের জন্য যত তাপই সৃষ্টি হোক না কেন ফলের টুকরোগুলো খুব একটা গরম হয় না।

৫৮। বরফে আগুন ধরানো !

প্রয়োজন ঃ এক টুকরো বরফ, কিছু ক্যালসিয়াম কার্বাইড (যাকে সাধারণত শুধু কার্বাইড বলা হয়) ও একটি দেশলাই।

পদ্ধতি ঃ সবাইকে জিজ্ঞাসা কর কেউ বরফে আগুন ধরাতে পারবে কিনা ?

কৌশল ঃ বরফে একটু ক্যালসিয়াম কার্বাইড চূর্ণ ছড়িয়ে দাও। এবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সেখানটায় ছোঁয়ালে বরফে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ বরফে সবসময় একটু জল থাকে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে এই জলের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস খুবই সহজদাহ্য আর এই গ্যাস জ্বলতে থাকলে মনে হয় যেন বরফই জ্বলছে।

$$CaC_2+2H_2O=Ca(OH)_2+C_2H_2$$

$$2C_2H_2+5O_2=4CO_2+2H_2O$$

৫৯। হাত ছোঁয়ালেই কালি !

প্রয়োজন ঃ পটাসিয়াম আয়োডাইড, ক্লোরিন ওয়াটার (ক্লোরিনের জলীয় দ্রবণ), ভাতের মাড় এবং একটি কাচের গ্লাস।

পদ্ধতি ঃ এক গ্লাস জলে তোমার একটা আঙ্‌ুল ডোবাতেই আঙ্‌ুলের স্পর্শে জলটা ধীরে ধীরে নীল কালিতে পরিণত হয়ে গেল।

কৌশল ঃ ক্লোরিন ওয়াটারে সামান্য একটু ভাতের মাড় গুলে নিয়ে আগে থেকেই গ্লাসে রাখতে হবে। আর তোমার আঙ্‌ুলে অল্প একটু পটাসিয়াম আয়োডাইড লাগিয়ে রাখবে। এখন গ্লাসের জলে আঙ্‌ুল ডোবালেই নীল রঙ তৈরি হবে।

ব্যাখ্যা ঃ ক্লোরিনের সঙ্গে পটাসিয়াম আয়োডাইডের বিক্রিয়ায় আয়োডিন উৎপন্ন হয়। এই আয়োডিন স্টার্চ (ভাতের মাড়) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নীল রঙ তৈরি করে। 'রঙের খেলা' (40 নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

মনে রাখবে ক্লোরিন ওয়াটার দীর্ঘ দিনের পুরোনো হলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ব্লিচিং পাউডারে লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ফিল্টার করে নিলেও ক্লোরিন ওয়াটার পাওয়া যায়।

$$2KI + Cl_2 = 2KCl + I_2$$

৬০। লাজুক মেয়ে !

প্রয়োজন ঃ লিকার অ্যামোনিয়া, ফেনলথেলিন এবং মোটা কাগজে আঁকা একটি ছোট মেয়ের ছবি।

পদ্ধতি ঃ তোমার সামনে টেবিলে সাধারণ কালি দিয়ে আঁকা একটি ছোট মেয়ের ছবি আছে। তুমি একটা শিশি ছবিটার কাছে ধরলে। ছবিটা ধীরে ধীরে গোলাপী হয়ে গেল। মেয়েটা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো ! তুমি সবাইকে বল যে শিশিতে ফলের রস আছে আর মেয়েটাকে এই ফলের রস খেতে বলাতেই সে লজ্জা পেয়ে গেল !

কৌশল ঃ জল ও স্পিরিটের মিশ্রণে ফেনলথেলিন দ্রবীভূত কর। আগে থেকেই মেয়েটার গালে তুলি দিয়ে এই দ্রবণ লাগিয়ে শুকিয়ে রাখ। এবার একটা লিকার অ্যামোনিয়া পূর্ণ শিশি মেয়েটার মুখের সামনে আনলেই ফেনলথেলিন লাগানো অংশ গোলাপী হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ লিকার অ্যামোনিয়ার শিশি থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বার হয়ে ফেনলথেলিন দ্রবণের সংস্পর্শে এসে লাল হয়ে যাচ্ছে। ছবিটা সামান্য ভিজে রাখবে।

৬১। সিরাপ থেকে জল, জল থেকে দুধ !

প্রয়োজন ঃ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সোডিয়াম সালফাইট, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, বেরিয়াম ক্লোরাইড এবং তিনটি কাচের গ্লাস।

পদ্ধতি ঃ টেবিলের উপর তিনটি কাচের গ্লাস রয়েছে ; প্রথম গ্লাসে আছে সিরাপ আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাস শূন্য।

এখন প্রথম গ্লাসের সিরাপ দ্বিতীয় গ্লাসে ঢালতেই তা ধীরে ধীরে জলে পরিণত হয়ে গেল। এবার এই জল তৃতীয় গ্লাসে ঢালতেই তা আবার সাদা দুধে পরিণত হল।

কৌশল ঃ প্রথমে গ্লাসে রাখতে হবে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের লঘু দ্রবণ, এটাকে দেখতে সিরাপের মত লাগবে। এতে কয়েক ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে নেবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাসে থাকবে যথাক্রমে অল্প সোডিয়াম সালফাইট চূর্ণ ও বেরিয়াম ক্লোরাইড চূর্ণ। এগুলো এভাবে রাখবে যাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাসকে খালি মনে হয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম গ্লাসের দ্রবণ দ্বিতীয় গ্লাসে ঢাললে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম সালফাইটের বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে। এই গ্যাসের সঙ্গে পটাস পারম্যাঙ্গানেটের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লাল রঙের পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে যাবে, ফলে মনে হবে সিরাপ জলে পরিণত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় গ্লাসের দ্রবণে এখন থাকবে পটাসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট ও ম্যাঙ্গানাস সালফেট। এই দ্রবণ তৃতীয় গ্লাসে ঢাললে এদের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় প্রতি ক্ষেত্রে সাদা রঙের অদ্রবণীয় বেরিয়াম সালফেট উৎপন্ন হবে। এর ফলে মনে হবে জলটা দুধ হয়ে গেল।

প্রথম গ্লাসের পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বেশী গাঢ় হলে কিন্তু সিরাপ জলে পরিণত হবে না, কারণ বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যাবে না। যেহেতু দ্বিতীয় গ্লাসে বেশী পরিমাণ সোডিয়াম সালফাইট রাখলে গ্লাসকে খালি মনে হবে না।

$$Na_2SO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O$$

$$2KMnO_4 + 2H_2O + 5SO_2$$
$$= K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4$$

$$K_2SO_4BaCl_2 = 2KCl + BaSO_4$$

৬২। বেলুন নিজে নিজেই ফুলছে !

প্রয়োজন ঃ কাপড় কাচা সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট), পাতিলেবুর রস, একটি ছোট শিশি ও একটি বেলুন।

পদ্ধতি ঃ তোমার হাতে একটি না ফোলানো কিন্তু মুখ বন্ধ বেলুন আছে। তুমি বেলুনটা নাড়াতেই সেটা ফুলতে সুরু করলো। সবাই তো অবাক !

কৌশল ঃ বেলুনের মধ্যে আগে থেকেই কিছু সোডার গুড়ো রেখে দিতে হবে। আর ছোট শিশির ভিতর পাতি লেবুর রস ভরে সেটা সাবধানে বেলুনের মধ্যে রাখতে হবে যাতে লেবুর রস শিশি থেকে বেরিয়ে এসে সোডার সংস্পর্শে না আসে। তারপর বেলুনের মুখ ভালভাবে সূতো দিয়ে বেঁধে রাখ।

ব্যাখ্যা ঃ বেলুন নাড়ালে লেবুর রস সোডার সংস্পর্শে আসে, ফলে লেবুর রসের সাইট্রিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম কার্বনেটের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর ফলেই বেলুন ফুলে যায়।

লেবুর রস ও সোডার পরিমাণ ঠিকমত নিতে হবে। কম হলে বেলুন ভালভাবে ফুলবে না আর বেশী হলে বেলুন ফেটে যেতে পারে। কাপড় কাচা সোডার বদলে খাওয়ার সোডা (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট) ও নেওয়া যায়। 'রাসায়নিক বন্দুক' (3 নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

৬৩। কথা শোনা দেশলাই কাঠি !

প্রয়োজন ঃ ওয়াটার গ্লাস (সোডিয়াম সিলিকেটের গাঢ় দ্রবণ), একটি দেশলাই।

পদ্ধতি ঃ তুমি তোমার বন্ধুকে একটা দেশলাই দিয়ে তাকে একটা কাঠি জালাতে বললে। সে একটা কাঠি জালাল, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বললে, নিভে যাও। সঙ্গে সঙ্গে কাঠি নিভে গেল। এরকম যতবার তোমার বন্ধু কাঠি জ্বালাল, তুমি বলামাত্র প্রতিবারই কাঠি নিভে গেল। সবাই মহা আশ্চর্য।

কৌশল ঃ আগে থেকেই দেশলাই বাক্সের প্রতিটা কাঠিতে বারুদের দিকে এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে বাকি দুই তৃতীয়াংশে তুলি দিয়ে ওয়াটার গ্লাস লাগিয়ে রাখবে। একবার ওয়াটার গ্লাস লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে আর

একবার লাগিয়ে ভাল করে শুকিয়ে রাখবে। এখন এই কাঠি জ্বালালে ওয়াটার গ্লাস না লাগানো অংশ ভালভাবেই জ্বলবে কিন্তু লাগানো অংশে আসা মাত্র আগুন হঠাৎ নিভে যাবে। তুমি ওয়াটার গ্লাস লাগানো অংশ খেয়াল রাখবে, আগুন বাড়তে বাড়তে ঐ অংশে আসা মাত্রই বলবে, নিভে যাও। তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ সোডিয়াম সিলিকেট হল অদাহ্য, একে অগ্নি প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফলে আগুন সোডিয়াম সিলিকেট লাগানো অংশে আসামাত্র নিজে থেকেই নিভে যাচ্ছে।

৬৪। আশ্চর্য ছবি !

প্রয়োজন ঃ ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট, ট্যানিক অ্যাসিড, তিনটে কাচের গ্লাস ও মোটা কাগজ।

পদ্ধতি ঃ একটা সাদা কাগজে সাধারণ কালি দিয়ে একটা মেয়ের মুখের আউটলাইন ছবি আঁকা আছে। তিনটে গ্লাসে পরিষ্কার জল রাখা আছে। তুমি একটা তুলি দিয়ে প্রথম গ্লাসের জল মেয়েটার চুলে বুলিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে চুলের রঙ কালো হয়ে গেল।

দ্বিতীয় একটা তুলি দিয়ে দ্বিতীয় গ্লাসের জল মেয়েটার চোখে বুলিয়ে দিলে চোখের রঙ হয়ে গেল নীল।

এবার তৃতীয় তুলি দিয়ে তৃতীয় গ্লাসের জল মেয়েটার মুখের বাকি অংশে লাগিয়ে দিলে তার রঙ হয়ে গেল লাল।

কৌশল ঃ আগে থেকেই মেয়েটার সমস্ত মুখে গাঢ় ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লাগিয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে। আর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাসে রাখতে হবে যথাক্রমে ট্যানিক অ্যাসিড, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ও অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের লঘু দ্রবণ। এই দ্রবণগুলো দেখতে জলের মতই লাগবে।

ব্যাখ্যা ঃ ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে কালো রঙের অদ্রবণীয় ফেরিক ট্যানেট উৎপন্ন হয়। আর ফেরিক ক্লোরাইডের সঙ্গে পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড ও অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেটের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় যথাক্রমে নীল ও লাল রঙ। 'রক্ত রক্ত' (2 নম্বর পরীক্ষা) এবং 'জলে জল মেশালেই নীল' (7 নম্বর পরীক্ষা) দেখ।

৬৫। নাম লেখা পেয়ারা !

প্রয়োজন ঃ একটা পেয়ারা গাছ যাতে পেয়ারা ফলেছে ও রাংতা।

পদ্ধতি ঃ তুমি পেয়ারার গায়ে যা লিখতে চাও রাংতা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত কেটে সেই অক্ষরগুলো তৈরি কর। এবার গাছের একটা বড় পেয়ারার গায়ে ভাল আঠা দিয়ে এই অক্ষরগুলো লাগিয়ে দাও। কিছুদিন পরে পেয়ারাটা পেড়ে নিয়ে অক্ষরগুলো তুলে ফেল। দেখবে পেয়ারার গায়ে সাদাটে রঙে তোমার মনোমত নাম লেখা রয়ে গেছে (পরীক্ষা 65)।

ব্যাখ্যা ঃ গাছের ফল পাতা ইত্যাদির সবুজ বা হলুদ রঙ হয় ক্লোরোফিলের জন্য। কিন্তু গাছের যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে না সেখানকার ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে জায়গাটা সাদাটে হয়ে যায়।

এখানে রাংতার অক্ষরগুলো দিয়ে পেয়ারার যে জায়গাটা ঢাকা ছিল সেখানে সূর্যের আলো না পড়াতে ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে গিয়ে সেখানটা সাদাটে হয়ে গেছে। তবে দেখতে হবে পেয়ারাটা গাছে থাকাকালীন যেন সূর্যের আলো পায়, নাহলে পেয়াররা সব জায়গাটাই সাদাটে হয়ে যাবে।



পরীক্ষা 65

ইচ্ছা করলে এভাবে পেয়ারা বা অন্য কোন ফলের গায়ে ছবিও আঁকতে পার।

৬৬। সিলিকা জেলের মজা !

প্রয়োজন ঃ ওয়াটার গ্লাস (সোডিয়াম সিলিকেটের গাঢ় দ্রবণ), লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, একটি বিকার ও একটি কাচের রড।

পদ্ধতি ঃ একটি বিকারে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও গরম ওয়াটার গ্লাস একই সঙ্গে ঢাল। সমস্ত জিনিষটা ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যাবে। একটা কাচের রড বিকারে ঢুকিয়ে দিলে সেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, পড়ে যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে সোডিয়াম সিলিকেটের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় শক্ত, অনেকটা কাচের মত দেখতে সিলিকা জেল, SiO_2, nH_2O উৎপন্ন হচ্ছে।

$$Na_2SiO_3+2HCl=2NaCl+SiO_2+H_2O$$

৬৭। নানা রঙের খেলা !

প্রয়োজন ঃ ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, বেরিয়াম ক্লোরাইড, ট্যানিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইট (সোডিয়াম বাই-সালফাইট)।

পদ্ধতি ঃ একটা কাচের জগে ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ নাও। এবার ছটা কাচের বিকারে যথাক্রমে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড, বেরিয়াম ক্লোরাইড, ট্যানিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইট দ্রবণ রাখ। সব দ্রবণই লঘু নেবে তাহলে দ্রবণগুলো বর্ণহীন হবে এবং জল বলে মনে হবে।

এবার জগ থেকে পরপর ছটা বিকারে একটু একটু 'জল' ঢাল। সঙ্গে সঙ্গে ছটা বিকারের 'জল' যথাক্রমে লাল, নীল, সাদা, কালো, সবুজ ও নীলচে হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা ঃ ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট হল ফেরিক সালফেট ও অ্যামোনিয়াম সালফেটের ডাবল সল্ট। ফেরিক সালফেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট ও পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের বিক্রিয়ায় যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের সৃষ্টি হয় (2 নম্বর ও সাত নম্বর পরীক্ষা)। ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সাদা রঙের অদ্রবণীয় বেরিয়াম সালফেট।

$$(NH_4)_2SO_4+BaCl_2=BaSO_4+2NH_4Cl$$

ফেরিক সালফেটের সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কালো রঙের অদ্রবণীয় ফেরিক ট্যানেট। টারটারিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় টার্ট্রেট কমপ্লেক্স গঠিত হওয়ায় রঙ হয় সবুজ। সোডিয়াম বাই-সালফাইট ফেরিক সালফেটকে ফেরাস সালফেটে বিজারিত করে, ফলে রঙ হয় নীলচে। এক্ষেত্রে সোডিয়াম বাই-সালফাইট সোডিয়াম বাই-সালফেটে জারিত হয়। ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেটের বদলে ফেরিক সালফেটও ব্যবহার করা যায়।

৬৮। চা হয়ে গেল জল !

প্রয়োজন ঃ আয়োডিন, পটাসিয়াম আয়োডাইড ও সোডিয়াম থায়োসালফেট (হাইপো)।

পদ্ধতি ঃ এক কাপ চায়ে একটু চিনি মেশানো হল। সঙ্গে সঙ্গে চা জলে পরিণত হয়ে গেল।

কৌশল ঃ জলের মধ্যে কিছু পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবীভূত কর। এই দ্রবণে একটু আয়োডিন মেশাও তাহলে দ্রবণের রঙ হবে বাদামী, ঠিক চায়ের মত। আগে থেকেই এই দ্রবণ তৈরি করে কাপে রেখে দেবে, এটা হল তোমার চা। আর তোমার চিনি হল আসলে হাইপো। এটা কাপের দ্রবণে মিশিয়ে নাড়লে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে যাবে, ফলে মনে হবে চাটা জল হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ আয়োডিনের সঙ্গে হাইপোর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সোডিয়াম টেট্রাথায়োনেট ও সোডিয়াম আয়োডাইড উৎপন্ন হয়, ফলে আয়োডিনের বাদামী রঙ নষ্ট হয়ে যায় (ফটোর দোকানে হাইপো পাওয়া যায়)।

$$2Na_2S_2O_3 + I_2 = Na_2S_4O_6 + 2NaI$$

৬৯। জল হল সিরাপ, সিরাপ হল চা !

প্রয়োজন ঃ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ট্যানিক অ্যাসিড ও দুটো স্টিল বা কাচের চামচ।

পদ্ধতি ঃ একটা কাচের গ্লাসে কিছু জল আছে। এবার প্রথম চামচ দিয়ে তা নাড়তেই জল পরিণত হল সিরাপে, অবার দ্বিতীয় চামচ দিয়ে এই সিরাপ নাড়তেই তা হয়ে গেল চা !

কৌশল ঃ প্রথম চামচে সামান্য একটু পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগানো ছিল, আর দ্বিতীয় চামচে ছিল সামান্য একটু ট্যানিক অ্যাসিড। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট খুব সামান্য নেবে।

ব্যাখ্যা ঃ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সাধারণ জলে দ্রবীভূত করলে দ্রবণের রঙ হবে লাল, তা সিরাপের মত লাগবে। এবার এই দ্রবণে ট্যানিক অ্যাসিড মেশালেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রবণের রঙ হয়ে যাবে বাদামী। তখন মনে হবে সিরাপ যেন চায়ে পরিণত হল।

ট্যানিক অ্যাসিডে সংকেত $C_{76}H_{52}O_{46}$।

৭০। জল দিয়ে আগুন ধরানো !

প্রয়োজন : পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, গ্লিসারিন ও একটি ড্রপার।

পদ্ধতি : একটা চিনামাটির কাপে কিছু পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট রয়েছে। এবার ড্রপারে করে 'জল' ঢালতেই পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জ্বলে উঠলো !

কৌশল : ড্রপারে করে 'জলের' বদলে গ্লিসারিন ঢালতে হবে কাপে।

ব্যাখ্যা : পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গ্লিসারিনকে জারিত করছে। এতেই গ্লিসারিনে আগুন ধরে যাচ্ছে।

৭১। জল থেকে কালি, কালি থেকে জল !

প্রয়োজন : ফেরিক সালফেট, ট্যানিক অ্যাসিড, অকজালিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি : টেবিলের উপরে রয়েছে পরিষ্কার জলভরা একটি কাচের জগ আর চারটে খালি গ্লাস। জগ থেকে প্রথম গ্লাসে জল ঢালতেই জলটা পরিণত হল কালিতে, জগের জল দ্বিতীয় গ্লাসে ঢালতে কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না, গ্লাসে পরিষ্কার জলই দেখা গেল। তৃতীয় গ্লাসে জগের জল ঢালতে তা আবার কালি হয়ে গেল, চতুর্থ গ্লাসে জগের জল ঢালতে দ্বিতীয় গ্লাসের মতই কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

এবার প্রথম তিনটে গ্লাসের জল ও কালি জগে ঢালতেই জগের সব জল কালিতে পরিণত হয়ে গেল। এখন চতুর্থ গ্লাসের জল জগে ঢালতেই জগের সব কালি আবার পরিষ্কার জলে পরিণত হল।

কৌশল : জগের জল আসলে ছিল ট্যানিক অ্যাসিডের দ্রবণ ; গরম জলে ট্যানিক অ্যাসিড মেশালে ভাল হয়। প্রথম ও তৃতীয় গ্লাসে আগে থেকেই কয়েক ফোঁটা ফেরিক সালফেটের গাঢ় দ্রবণ রেখে দেব। দ্বিতীয় গ্লাস ছিল সত্যি সত্যিই শূন্য আর চতুর্থ গ্লাসে ছিল সামান্য একটু অকজালিক অ্যাসিড।

ব্যাখ্যা : প্রথম ও তৃতীয় গ্লাসে ফেরিক সালফেটের সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কালো রঙের অদ্রবণীয় ফেরিক ট্যানেট উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ জলটা কালিতে পরিণত হয়। কালির প্রধান উপাদান ফেরাস ট্যানেট ও গ্যালেট এবং ফেরিক ট্যানেট ও গ্যালেট। এবার চতুর্থ গ্লাসের জল জগে ঢাললে এই গ্লাসের অক্জালিক অ্যাসিড জগের ফেরিক ট্যানেটকে ফেরাস ট্যানেটে বিজারিত করে। ফেরাস ট্যানেট জলে দ্রবণীয় আর বর্ণহীন, ফলে

কালি পরিষ্কার জলে পরিণত হয়। চতুর্থ গ্লাসে অক্জালিক অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণে রাখতে হবে, নাহলে কালো রঙ সম্পূর্ণরূপে দূর হবে না।

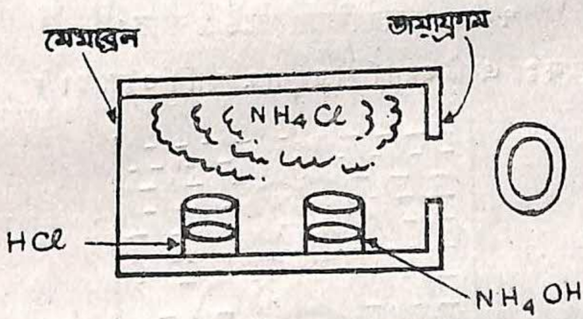
৭২। ভর্টেক্স বলয়ের খেলা!

প্রয়োজন ঃ অধ্যাপক টেইটের (Tait) ভর্টেক্স বাক্স, লিকার অ্যামোনিয়া ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

অধ্যাপক টেইটের ভর্টেক্স বাক্স হল একটি চোঙাকার বাক্স (চিত্র বার) যার এক প্রান্ত কোন নমনীয় জিনিষ যেমন চামড়ার তৈরি, একে বলে মেমব্রেন। এর বিপরীত প্রান্ত ডায়াফ্রামে একটি গোলাকার ছিদ্র আছে (ব্যাস কুড়ি-পঁচিশ সেন্টিমিটার)। বাক্সটি প্রয়োজনে খোলা যায়।

প্রস্তুতি ঃ ভর্টেক্স বাক্সের ভিতর একটি বিকারে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও অন্য একটি বিকারে লিকার অ্যামোনিয়া রেখে বাক্স বন্ধ করে দাও।

পদ্ধতি ঃ এবার মেমব্রেনে হাত দিয়ে ভিতর দিকে চাপ দাও। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখবে ডায়াফ্রামের ছিদ্রের সামনে সুন্দর সাদা ভর্টেক্স বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাস বা তরলের ঘূর্ণমান বলয়কে বলে ভর্টেক্স বলয় (Vortex ring)।



পরীক্ষা 72

এভাবে যতবার মেমব্রেনে চাপ দেবে ততবার ভার্টেক্স বলয়ের সৃষ্টি হবে। তবে মেমব্রনে একনাগাড়ে চাপ দিয়ে রাখবে না, মাঝে মাঝে চাপ দেবে।

ডায়াফ্রামে একটি বড় ছিদ্র না থেকে যদি চালুনির মত অনেকগুলি ছোট ছোট ছিদ্র থাকত তাহলেও অনেকগুলি ছোট ছোট ভর্টেক্স বলয় সৃষ্টি না হয়ে একটিমাত্র বড় ভর্টেক্স বলয় সৃষ্টি হত।

ব্যাখ্যা ঃ বাক্সের ভিতর অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের

রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হয় যা আসলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সূক্ষ্ম চূর্ণ ছাড়া আর কিছুই নয় (1 নম্বর পরীক্ষা দেখ)।

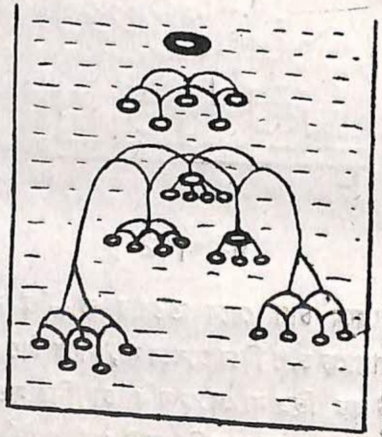
মেমব্রেনে চাপ দেওয়ার ফলে এই ধোঁয়ার কিছু অংশ ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভিতর থেকে আসা গতিশীল ধোঁয়াযুক্ত বাতাসের সঙ্গে বাইরের স্থির বাতাসের সান্দ্র (Viscous) ঘর্ষণের ফলে ঘূর্ণমান ভর্টেক্স বলয়ের সৃষ্টি হয়।

যে ধর্মের দ্বারা কোন তরল বা গ্যাসের বিভিন্ন স্তর নিজেদের মধ্যে আপেক্ষিক গতিকে (এক স্তরের তুলনায় অন্য স্তরের গতিকে) বাধা দেয় তাকে বলে সান্দ্রতা (Viscosity)। যেমন জলের চেয়ে আলকাতরার সান্দ্রতা বেশী, ফলে একটি জলপূর্ণ পাত্রকে কাৎ করলে যত তাড়াতাড়ি জলের উপরিতল এক-সমতলে আসে আলকাতরার পাত্রকে কাৎ করলে আলকাতরার উপরিতল তার চেয়ে অনেক দেরিতে এক-সমতলে আসে। সান্দ্রতার সঙ্গে কঠিন পদার্থের ঘর্ষণের কিছুটা মিল আছে।

কারও গায়ে এই ভর্টেক্স বলয় এসে লাগলে মনে হবে যেন নরম কোন তুলোর প্যাড দিয়ে আঘাত করা হল। ভর্টেক্স বলয়ের শুধু দৃশ্যমান অংশই যে ঘূর্ণায়মান থাকে তা নয়, চারপাশের কিছু বায়ুও একই সঙ্গে ঘূর্ণায়মান থাকে।

৭৩। জলের ভিতর ভর্টেক্স বলয়!

প্রয়োজন ঃ একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্র, কালি ও ড্রপার।



পরীক্ষা 73

পদ্ধতি ঃ পাত্রের জলে ড্রপারের সাহায্যে দুই-তিন সেন্টিমিটার উঁচু

থেকে এক ফোঁটা কালি ফেলে দাও, জল যেন স্থির থাকে। দেখবে জলের মধ্যে কালির একটি ভর্টেক্স বলয় সৃষ্টি হয়েছে। এই বলয় ভেঙে কয়েকটি নতুন বলয়ের সৃষ্টি হবে, সেগুলি থেকে আবার কয়েকটি ছোট বলয়ের সৃষ্টি হবে, এভাবে নীচের দিকে ক্রমাগত বলয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, ফলে একটি সুন্দর মন্দিরের মত তৈরি হবে (পরীক্ষা 73)।

ব্যাখ্যা : তল-টানের জন্য বলয়গুলি ফুলে ওঠে, ফলে তারা কয়েকটি ফোঁটায় ভেঙে যায় আর প্রত্যেক ফোঁটা থেকে একটি করে নতুন বলয় উৎপন্ন হয়।

৭৪। সবুজ থেকে বেগুনী !

প্রয়োজন : পটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট।

প্রস্তুতি : পটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেটের একটি অতি গাঢ় দ্রবণ তৈরি কর, দ্রবণের রঙ হবে সবুজ।

পদ্ধতি : এবার একটা বড় পাত্রে অনেকটা জল নিয়ে তাতে অল্প একটু এই গাঢ় দ্রবণ ঢেলে দাও। সবাই দেখবে জলের রঙ হয়ে যাবে বেগুনী।

ব্যাখ্যা : সবুজ রঙের পটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বেগুনী রঙের পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে পরিণত হয়! জলে যে কোন অ্যাসিড মেশানো থাকলে জল কম হলেও চলে।

$$3K_2MnO_4 + 4HCl = 2KMnO_4 + 4KCl + MnO_2 + 2H_2O$$

৭৫। লাল থেকে হলুদ !

প্রয়োজন : পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট এবং কস্টিক পটাস।

প্রস্তুতি : একটি বিকারে একটু পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণ তৈরি কর, রঙ হবে লাল। আর একটি বিকারে প্রস্তুত কর কস্টিক পটাসের দ্রবণ, এটা হবে বর্ণহীন। সাবধান কস্টিক পটাস বা তার দ্রবণ যেন গায়ে না লাগে।

পদ্ধতি : এখন লাল রঙের ডাইক্রোমেট দ্রবণে যদি একটু কস্টিক পটাস দ্রবণ (যাকে তুমি বলবে জল) মেশাও তাহলে তা হয়ে যাবে হলুদ !

ব্যাখ্যা : পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের সঙ্গে কস্টিক পটাসের বিক্রিয়ায় হলুদ রঙের পটাসিয়াম ক্রোমেট উৎপন্ন হয়। এই খেলাটা বিপরীতভাবেও

দেখানো যায়। যদি তুমি হলুদ রঙের পটাসিয়াম ক্রোমেটের দ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও তবে তা পরিণত হবে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটে, ফলে দ্রবণের রঙ হয়ে যাবে লাল।

$$K_2Cr_2O_7 + 2KOH = 2K_2CrO_4 + H_2O$$

$$2K_2CrO_4 + H_2SO_4 = K_2Cr_2O_7 + K_2SO_4 + H_2O$$

৭৬। সাবান প্রস্তুত।

প্রয়োজন : নারকেল তেল, কষ্টিক সোডা ও একটি বিকার।

পদ্ধতি : বিকারে নারকেল তেলের সঙ্গে কষ্টিক সোডার দ্রবণ মিশিয়ে ফোটাও। কিছুক্ষণ ফোটাবার পরে বিকারের তরলে কিছু নুন মিশিয়ে আবার ফোটাও। বিকারের তরলের উপরে সাবান ভেসে উঠবে।

ব্যাখ্যা : সাবান হল ওলিক (Oleic), ষ্টিয়ারিক (stearic), পামিটিক (Palmitic) ইত্যাদি ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবন। আর চর্বি ও ভোজ্য তেল হল গ্লিসারিণ ও এই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্লিসারিণের ট্রাই-এস্টার (tri-ester)। এজন্য চর্বি ও ভোজ্য তেলকে ট্রাই-গ্লিসারাইডও বলে। যে কোন ভোজ্য তেলের সঙ্গে কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক পটাশ দ্রবণ মিশিয়ে ফোটালে সাবান উৎপন্ন হয়। নুন মেশালে উৎপন্ন সাবান আর জলে দ্রবীভূত না থাকতে পেরে পৃথক হয়ে পড়ে ও হালকা হওয়ায় উপরে ভেসে ওঠে। কষ্টিক সোডার বদলে কষ্টিক পটাশ ব্যবহার করলে নুনের বদলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড মেশাতে হবে।

তেল + কষ্টিক সোডা = গ্লিসারিণ + সাবান

পামিটিক অ্যাসিডের সংকেত $C_{15}H_{31}COOH$ সুতরাং সোডিয়াম পামিটো সাবানের সংকেত $C_{15}H_{31}COONa$। ওলিক অ্যাসিড – $C_{17}H_{33}COOH$, ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড—$C_{17}H_{35}COOH$।

৭৭। সীসা গাছ।

প্রয়োজন : লেড নাইট্রেট বা লেড অ্যাসেটেট (sugar of lead), কয়েকটি পরিস্কার দস্তার পাতলা পাত ও একটি বিকার বা কাচের বোতল।

পদ্ধতি : ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে লেড নাইট্রেট বা অ্যাসেটেটের দ্রবণ তৈরি

কর। বিকারে বা বোতলে এই দ্রবণ নিয়ে তাতে দস্তার পাতগুলি ঝুলিয়ে রাখ (চিত্র 14)।

বোতলটিকে স্থিরভাবে রেখে দিলে কয়েক ঘণ্টা পরে দেখবে দ্রবণ হতে সীসা পৃথক হয়ে দস্তার পাতের গায়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে গাছের আকারে কেলাসিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ দস্তা লেড নাইট্রেট, $Pb(NO_3)_2$ বা লেড অ্যাসেটেট, $Pb(CH_3COO)_2, 3H_2O$ এর দ্রবণ হতে সীসাকে অপসারিত করে।

$$Pb(CH_3COO)_2 + Zn = Zn(CH_3COO)_2 + Pb$$



চিত্র 14 (পরীক্ষা 77)

এই পরীক্ষায় সীসার যে কোন দ্রবণীয় লবণের দ্রবণ নেওয়া যায়। আর্দ্র বিশ্লেষণের (Hydrolysis) ফলে লেড অ্যাসেটেটের দ্রবণ কিছুটা ঘোলাটে হয়, এতে সামান্য অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিলে দ্রবণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

রূপা বা সীসার লবণের দ্রবণ সর্বদা ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে করবে কারণ সাধারণ জলে ক্লোরাইড লবণ বা ক্লোরিন থাকায় অদ্রবণীয় সিলভার (বা লেড) ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে ফলে দ্রবণ ঘোলাটে হয়।

৭৮। মজার বলয় !

প্রয়োজন ঃ হিরাকস, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড।

পদ্ধতি ঃ একটি টেষ্ট টিউবে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড বা কোন নাইট্রেটের দ্রবণ নিয়ে তাতে সমায়তন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। জলে গাঢ়

সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে জল উত্তপ্ত হয়ে চারদিকে ছিটকে যেতে পারে। সেইজন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাবে। উষ্ণ মিশ্রণকে ঠাণ্ডা কর। কখনো গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল মেশাবে না কারণ তাহলে অ্যাসিড চারদিকে ছিটকে যেতে পারে, সর্বদা জলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাবে।

এখন টেস্ট টিউবের গা বেয়ে সমায়তন সগু প্রস্তুত হিরাকসের দ্রবণ ঢাল। সবাই অবাক হয়ে দেখবে উভয় দ্রবণের স্পর্শতলে একটি সুন্দর বাদামী রঙের বলয় সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র 15)।



চিত্র 15 (পরীক্ষা 78

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমে নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অক্সাইডে (NO) বিজারিত হয়। এই নাইট্রিক অক্সাইড অতিরিক্ত হিরাকসের ($FeSO_4$) সঙ্গে ফেরাস নাইট্রোসিল সালফেট, Ferrous Nitrosyl sulphate, $[FeNO]SO_4$ এর বাদামী বলয় গঠন করে। দ্রবণ উষ্ণ হলে কোন বলয় তৈরি হয় না কারণ বেশী উষ্ণতায় $[FeNO]SO_4$ ভেঙে যায়।

$$6FeSO_4+3H_2SO_4+2HNO_3=3Fe_2(SO_4)_3+2NO+4H_2O$$

$$FeSO_4+NO=[FeNO]SO_4$$

৭৯। রূপার আয়না!

প্রয়োজন ঃ সিলভার নাইট্রেট, লিকার অ্যামোনিয়া, ফর্মালডিহাইড বা টারটারিক অ্যাসিড ও একটি টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি ঃ ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ তৈরি কর। লিকার অ্যামোনিয়ায় জল মেশাও ফলে লঘু অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, NH_4OH দ্রবণ তৈরি হবে। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে ধীরে ধীরে NH_4OH দ্রবণ ঢাল, প্রথমে সিলভার মনোক্সাইডের, Ag_2O অধঃক্ষেপ পড়ে ; অতিরিক্ত NH_4OH মেশালে এই Ag_2O দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই দ্রবণকে বলে টোলেনের বিকারক (Tollen's reagent)।

এবার একটি টেস্ট টিউবে এই দ্রবণ নিয়ে তাতে একটু ফর্মালডিহাইড বা টারটারিক অ্যাসিড দ্রবণ মিশিয়ে অল্প গরম কর। দেখবে টেস্ট টিউবের ভিতরের গা আয়নার মত চক্‌চকে হয়ে উঠেছে !

ব্যাখ্যা ঃ সিলভার মনোক্সাইডের সঙ্গে NH_4OH ডাই—অ্যামাইন সিলভার হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। ফর্মালডিহাইড (Formaldehyde, HCHO) একে রূপায় বিজারিত করে। টেস্ট টিউবের ভিতরের গায়ে এই রূপার প্রলেপ পড়ায় তা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়, ফলে তা আয়নার মত উজ্জ্বল লাগে।

এই পরীক্ষার সাহায্যে যে কোন অ্যালডিহাইডকে সনাক্ত করা যায়।

$$2AgNO_3 + 2NH_4OH = Ag_2O + 2NH_4NO_3 + H_2O$$

$$Ag_2O + 4NH_4OH = 2Ag(NH_3)_2OH + 3H_2O$$

$$HCHO + 2Ag(NH_3)_2OH$$
$$= HC.ONH_4.O + 2Ag + 3NH_3 + H_2O$$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টারটারিক অ্যাসিড ডাই-অ্যামাইন সিলভার হাইড্রক্সাইডকে রূপায় বিজারিত করে এবং নিজে টারটোনিক অ্যাসিডে (Tartonic acid) জারিত হয়।

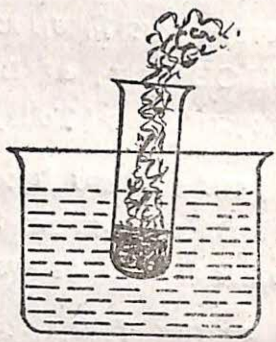


টারটোনিক অ্যাসিড

৮০। বিনা তাপে ফোটানো!

প্রয়োজন : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, জল, বিকার ও একটি টেস্ট টিউব।

পদ্ধতি : বিকারে কিছু জল নিয়ে তাতে সমায়তন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে মেশাও। মিশ্রণ কাচদণ্ডের সাহায্যে নাড়। এবার একটি টেস্ট টিউবে অল্প স্পিরিট নিয়ে টেস্ট টিউবটিকে মিশ্রণে আংশিক ডুবিয়ে ধর। টেস্ট টিউবটি কাগজের সাহায্যে ধর যাতে হাতে গরম না লাগে। একটু পরেই দেখবে, টেস্ট টিউবের স্পিরিট ফুটতে শুরু করেছে (চিত্র 16)।



চিত্র 16 (পরীক্ষা ৮০)

ব্যাখ্যা : গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে জল মেশালে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় ফলে তা খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এতেই স্পিরিট ফুটতে থাকে।

পরিবেশ দূষণ

তোমরা নিশ্চয়ই পরিবেশ দূষণ কথাটা শুনেছ। পরিবেশ দূষণ বলতে কি বোঝায়?

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশকে দুভাগে ভাগ করা যায় ভৌত (Abiotic অর্থাৎ জড়) পরিবেশ ও জৈব (Biotic অর্থাৎ সজীব) পরিবেশ। বায়ুমণ্ডল, নদনদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, মাটি, বাড়িঘর, কল কারখানা, শব্দ ইত্যাদি সমস্ত জড় পদার্থ ও শক্তি ভৌত পরিবেশের অন্তর্গত আর সব প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে হল জৈব পরিবেশ।

আমাদের পরিবেশ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তা আমাদের শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে তবে তাকেই বলা হয় পরিবেশ

দূষণ (Pollution)। পরিবেশ দূষণ প্রধানত বারো প্রকার যথা বায়ু দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, উদ্ভিদ দূষণ, কীটপতঙ্গ দূষণ, ভূমিক্ষয়, জল দূষণ, খাদ্য দূষণ, ঔষধ দূষণ, নেশা, শব্দ দূষণ, উষ্ণতা দূষণ ও তেজস্ক্রিয়তা।

পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে গুরুতর দিক হোল, এর ক্ষতিকর প্রভাব অনেক সময়ই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে এর অনিষ্টকর প্রভাব বাড়তে বাড়তে যখন ধরা পড়ে তখন প্রায়শই তা আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এইজন্য পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই অচেতন থাকি।

বায়ু দূষণ : কয়লা, কাঠ, কেরোসিন বা গ্যাসের উনানের ধোঁয়া ও গ্যাস ; কলকারখানা, মোটর, বাস ইত্যাদির ধোঁয়া ও গ্যাস ক্রমাগত বাতাসকে দূষিত করছে। সাধারণত এইসব ধোঁয়া ও গ্যাসে থাকে কার্বনের সূক্ষ্ম কণা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, ও মিথেন (CH_4) ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন (যে সব যৌগ শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত তাদের বলে হাইড্রোকার্বন)। কখনও কখনও এদের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প, ক্লোরিন ইত্যাদি গ্যাসও থাকে। এই সব গ্যাসই বিষাক্ত।

বায়ুদূষণের ফলে অন্যান্য রোগ ছাড়াও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ইত্যাদি অ্যালার্জিঘটিত রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি বাতাসে ভাসমান ফুলের পরাগ রেণু থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। এছাড়া ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ বায়ুদূষণ। দেখা গেছে যেসব মহিলা রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কাজ করেন, ধূমপান না করলেও তাদের ফুসফুসের ক্যানসার বেশী হয়।

কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তো অত্যন্ত বিষাক্ত। আটশ আয়তন বাতাসে এক আয়তন কার্বন মনোক্সাইড থাকলেও আধ ঘন্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই গ্যাস প্রায় গন্ধহীন হওয়ায় কোন কিছু টের পাওয়ার আগেই ঘুমন্ত মানুষের মৃত্যু হয়। কম বায়ুতে কার্বন বা কার্বনের কোন যৌগের দহনে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এর জন্যই ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে মোম বা হারিকেন ধরিয়ে বা উনান জালিয়ে ঘুমোবার ফলে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে।

বায়ুতে সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড বেশী পরিমাণে থাকলে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ জলের সঙ্গে এইসব অক্সাইডের বিক্রিয়ায় সালফিউরাস, সালফিউরিক, নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে তা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে এসে পড়তে পারে।

পরিত্যক্ত কূয়াতে অনেক সময় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমে থাকায় মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে—একথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। এ জন্য কূয়াতে মানুষ নামার আগে একটি জলন্ত বাতি তাতে নামিয়ে দেখতে হয়—কূয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমে থাকলে বাতি এমনভাবে নিভে যায় যেন বাতিটিকে জলে ডোবানো হয়েছে।

যেখানে একশ বছর আগে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল দশ লক্ষ ভাগে 250 ভাগ সেখানে বর্তমানে আছে 330 ভাগ। এ থেকেই বুঝতে পারছ বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণে কিভাবে বাড়ছে।

বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (Chloroflurocarbons—বিভিন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং রাবার শিল্পে ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি গ্যাস বেশী থাকলে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। একে বলে সবুজ ঘর প্রভাব (Greenhouse effect)। এর কারণ হল এসব গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বেশী উষ্ণ বস্তু থেকে বিকীর্ণ তাপ যেতে পারে কিন্তু কম উষ্ণ বস্তু থেকে বিকীর্ণ তাপ যেতে পারে না। সুতরাং এসব গ্যাস বাতাসে বেশী থাকলে সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপ মাটিতে এসে পৌছতে পারে কিন্তু এর ফলে মাটি উত্তপ্ত হয়ে যে তাপ বিকীর্ণ করে, তা কম উষ্ণ মাটি থেকে আসায়, বায়ু ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। ফলে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুর উষ্ণতা বেড়ে যায়।

একে সবুজঘর প্রভাব বলে কারণ কাচেরও এরকম ধর্ম আছে। এজন্য শীত প্রধান দেশে কাচ নির্মিত ঘরে শীত সহ করতে পারে না, এ ধরণের গাছপালা রাখা হয়। কাচের এই ধর্মের জন্য কাচের এই ঘর যাকে বলে সবুজঘর, গরম থাকে।

কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন এই সবুজঘর প্রভাবের জন্য পৃথিবীর উষ্ণতা এক দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে মেরুর বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্র জলের উচ্চতা 2010 সালের মধ্যে প্রায় দেড় মিটার বৃদ্ধি পাবে। ফলে বন্যা হবে আর সমুদ্রের নোনাজলে প্রবেশ করায় সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলির চাষবাসের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক জায়গায়ও জলে ডুবে যাবে।

বায়ু দূষণের আরেকটি মারাত্মক দিক হল ওজোনের (Ozone—O_3) ক্ষয়। ওজোন গ্যাস হল অক্সিজেনের রূপভেদ (Allotrope)। ওজোন অত্যন্ত বিষাক্ত, এমনকি পটাশিয়াম সায়ানাইড বা কার্বন মনোক্সাইডের চেয়েও বিষাক্ত। তা সত্ত্বেও হাসপাতাল, ভূগর্ভ রেলপথ ইত্যাদিতে বাতাসকে জীবাণুমুক্ত করতে খুব সামান্য পরিমাণে ওজোন (লক্ষ ভাগে বাতাসে এক ভাগ) ব্যবহৃত হয়। ওজোন তীব্র জারক বলে তা জীবকোষের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে জারিত করে কোষকে ধ্বংস করে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছশো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। বায়ু—মণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে নীচের স্তরের নাম ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), এ ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 (মেরু অঞ্চলে) থেকে 20 (বিষুব অঞ্চলে) কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা 70 ভাগ এই স্তরে আবদ্ধ। এই স্তরই পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ট্রোপোস্ফিয়ারের পরের স্তররে নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। ভূপৃষ্ঠের 30 কিমি ঊর্দ্ধ পর্যন্ত এর সীমা। এখানে বায়ু শান্ত।

এর উপরের স্তর হল মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere)। ভূপৃষ্ঠের 100 কিমি ঊর্দ্ধ পর্যন্ত এর বিস্তার। এর পরের স্তর থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere) পৃথিবী পৃষ্ঠের 400 কিমি ঊর্দ্ধ পর্যন্ত এর সীমা। থার্মোস্ফিয়ারের উপরের স্তরের নাম আয়ন মণ্ডল (Ionosphere), মাটির 550 কিমি ঊর্দ্ধ পর্যন্ত এর বিস্তার। সবচেয়ে বাইরের স্তর হল বহির্মণ্ডল (Exosphere), ভূপৃষ্ঠের প্রায় 600 কিমি ঊর্দ্ধ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

বায়ুমণ্ডলে ভূপৃষ্ঠ থেকে 20-50 কিমি ঊর্দ্ধে রয়েছে ওজোনের আবরণ যাকে বলে ওজোন মণ্ডল (Ozonosphere) অর্থাৎ ওজোন আছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেসোস্ফিয়ারে। মাটি থেকে 25 কিমি উচ্চতায় ওজোন থাকে সবচেয়ে বেশী।

এই ওজোন অনেক ঊর্দ্ধে থাকায় জীবজগতের কোন ক্ষতি করে না পক্ষান্তরে সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্র থেকে আসা নানারকম বিপজ্জনক রশ্মি ও কণাকে শোষণ করে সমস্ত জীবকে রক্ষা করে। ওজোনমণ্ডল না থাকলে মহাবিশ্ব থেকে আসা বিভিন্ন বিকিরণ ও কণার প্রভাবে ক্যানসার রোগ

(বিশেষ করে ত্বকের ক্যানসার) অনেক বৃদ্ধি পাবে, জীবকোষের জীনের (gene) নানারকম ক্ষতিকর মিউটেশান (Mutation, হঠাৎ পরিবর্তন) ব্যাপকভাবে দেখা দেবে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ বাধাগ্রস্ত হবে, সব জীবাণু (উপকারী অপকারী নির্বিশেষে) ধ্বংস হবে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে সমস্ত জীব লোপ পাবে।

বর্তমানে নানা কারণে এই ওজোন মণ্ডল ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। যেমন বিভিন্ন ক্লোরিনঘটিত কীটনাশক ও ক্লোরোফ্লুরোকার্বন শ্রেণীর যৌগ থেকে ক্লোরিন বেরিয়ে এসে ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়।

জেট বিমান ও রকেট থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস যেমন নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনমণ্ডলকে ক্ষয় করে। $NO+O_3 = NO_2+O_2$।

পরমাণু বিস্ফোরণে উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপে ওজোন অক্সিজেনে পরিণত হয়। মাত্র 200°C উষ্ণতাতেই ওজোন অক্সিজেনে ভেঙে যায়। $2O_3=3O_2$।

এছাড়া পরমাণু বিস্ফোরণের প্রচণ্ড তাপে বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিলে নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে। আগেই বলা হয়েছে নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনকে ক্ষয় করে।

অন্যদিকে দেখা গেছে মিথেন গ্যাস ওজোন সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন ওজোন শতকরা এক ভাগ কমে গেলে অতি বেগুনী রশ্মির তীব্রতা শতকরা দুইভাগে বৃদ্ধি পাবে। পরিণামে বছরে প্রায় দশ হাজার মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হবে।

বায়ুদূষণের আরেকটি কারণ হল মোটর ইত্যাদির ধোঁয়া। মোটর গাড়ির এঞ্জিনে পেট্রোলের দহনের সময় বিস্ফোরণ ঘটে ফলে এঞ্জিনের ক্ষতি হয়। এরজন্য পেট্রোলের সঙ্গে অল্প পরিমাণে টেট্রা ইথাইললেড (Tetra ethyllead), $(C_2H_5)_4Pb$ বা টেল (TEL) মেশানো হয়, এতে দহনের সময় বিস্ফোরণ বন্ধ হয়। কিন্তু এর ফলে মোটরের এঞ্জিনে ধাতব সীসা জমা হয়। তা দূর করতে পেট্রোলে আবার মেশানো হয় ইথিলিন ব্রোমাইড (Ethylene bromide, $C_2H_4Br_2$)। এক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় লেড ব্রোমাইড, $PbBr_2$ যা এঞ্জিনের উচ্চ উষ্ণতায় গ্যাস আকারে নির্গত হয়। সীসা খুব বিষাক্ত বলে এই গ্যাসও অত্যন্ত ক্ষতিকর। গাড়ির ধোঁয়াতে এছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি বিষাক্ত গ্যাসও থাকে।

বায়ুদূষণ বন্ধ করতে হলে কলকারখানা থেকে ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস যাতে না বেরোয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। ধোঁয়া বেরোবার চিমনিকে খুব উঁচু করতে হবে। ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কথাতো তোমরা সবাই জান। বিষাক্ত গ্যাস যে কতটা মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে তা এই দুর্ঘটনা থেকেই ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এছাড়া উনানে ধোঁয়াহীন কয়লা বা সম্ভব হলে গ্যাসের উনান ব্যবহার করতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো শীতের দিনে সন্ধ্যাবেলা উনানের ধোঁয়ায় শহরের রাস্তায় কিরকম দমবন্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আর মোটরের ধোঁয়ার লেড ব্রোমাইড দূর করতে হলে এমন ধরণের পেট্রোল ব্যবহার করতে হবে যার দহনের সময় বিস্ফোরণ ঘটবে না ফলে এঞ্জিনের ঝাঁকুনিও (Knocking) হবে না। এতে পেট্রোলের সঙ্গে আর টেল (ঝাঁকুনি বন্ধ করে বলে যাকে বলা হয় antiknock) মেশাতে হবে না। এই ধরণের পেট্রোলকে বলে সীসাহীন (no-lead) বা কমসীসা (low-lead) পেট্রোল। পেট্রোলের মধ্যে শাখাশৃঙ্খলযুক্ত (Branched-chain) হাইড্রোকার্বনের অনুপাত বাড়িয়ে সীসাহীন পেট্রোল তৈরি করা যায়। কৃত্রিমভাবে এই ধরণের পেট্রোল তৈরি করা হয়েছে।

কোন্ পেট্রোল ব্যবহারে এঞ্জিনের ঝাঁকুনি কত হবে তা বোঝানো হয় তার অক্টেন সংখ্যা (Octane number) দিয়ে। অক্টেন সংখ্যা যত বেশী হবে সেই পেট্রোলে এঞ্জিনের ঝাঁকুনি তত কম হবে। অক্টেন সংখ্যার সর্বোচ্চ মান 100, এ হল আইসোঅক্টেনের (Isooctane) অক্টেন সংখ্যা কারণ আইসোঅক্টেন ব্যবহারে এঞ্জিনের কোন ঝাঁকুনি হয় না।

তবে সবচেয়ে ভাল হয় পেট্রোল ও ডিজেল বন্ধ করে বিদ্যুৎ, অ্যালকোহল বা হাইড্রোজেনের সাহায্যে মোটর, বাস ইত্যাদি চালালে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, কোথাও কোথাও এ ধরনের গাড়ি চালানোও হচ্ছে। এ রকম গাড়ির সুবিধা হল কোনও ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বা গ্যাসই এরা সৃষ্টি করে না অর্থাৎ এরা সম্পূর্ণ রূপে দূষণ মুক্ত।

মৃত্তিকা দূষণ ঃ আবর্জনা, প্রাণীদের বর্জপদার্থ ও কলকারখানা থেকে নির্গত নানা রাসায়নিক পদার্থ মাটিকে দূষিত করে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে নানা রকম অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়।

অতিরিক্ত অজৈব সার মাটির উর্বরাশক্তিকে নষ্ট করে ও মাটিকে দূষিত করে। সুতরাং সার প্রয়োগে সংযত হওয়া প্রয়োজন। শস্যের আবর্তনে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের (যেমন একবার ধান, অন্যবার ডাল) চাষকেই শস্যের আবর্তন বলে। মাঝে মাঝে ডাল জাতীয় শস্যের চাষ করলে মাটির নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ফলে জমির উর্বরতা শক্তি খুব বেড়ে যায়।

বিজ্ঞানের কল্যাণে নানা অধিক ফলনশীল শস্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনেক অধিক ফলনশীল শস্যেরই রোগ ও কীট প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। ফলে জমিতে বেশী পরিমাণে রোগ ও কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত বলে মাটিকে দূষিত করে। সুতরাং কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার যথা সম্ভব কমিয়ে জৈব নিয়ন্ত্রণের (Biological control) আশ্রয় নিতে হবে। জৈব নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝার ক্ষতিকর জীবকে অন্য ধরণের জীবের সাহায্যে ধ্বংস করা।

অবশ্য জৈব নিয়ন্ত্রণও সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত। যেমন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক সময় ইঁদুরের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় আখ চাষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। তখন ইঁদুর মারার জন্য ভারত থেকে সেখানে বেজী নিয়ে যাওয়া হয়। বেজীরা কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে ইঁদুরদের নির্মূল করে। তখন খাদ্যাভাবে বেজীরা গৃহপালিত পশুদের খেতে শুরু করে। তারপর অনেক চেষ্টা করে বেজীদের নিয়ন্ত্রন করতে হয়।

অ্যাসিড বৃষ্টির কথা আগেই বলা হয়েছে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে মাটি দূষিত হয় ও উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

মৃত্তিকা দূষণ রোধ করতে হলে আবর্জনা থেকে সার ও বিদ্যুৎ তৈরি করার ব্যবস্থা করতে হবে। গরু মোষের খাটাল থেকে নানাবিধ রোগ ছড়ায়। সুতরাং খাটালগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে ডেয়ারি স্থাপন করতে হবে।

উদ্ভিদ দূষণ : গাছ আমাদের অনেক উপকার করলেও কিছু গাছ আবার পরিবেশ দূষিতও করে। যেমন র‍্যাগউইড গাছের পরাগরেণু থেকে হে ফিভারের সৃষ্টি হয়। ঝাউ, কুর্চি, আকাশমণি ইত্যাদি গাছের পরাগরেণু (যেগুলি বাতাসে ভেসে বেড়ায়) থেকেও হাঁপানি ও অ্যালার্জিজনিত নানা উপসর্গ দেখা দেয়। পার্থেনিয়াম গাছের বিষাক্ত প্রভাবের কথা তোমরা

নিশ্চয়ই জান, এ থেকে কাশি, হাঁপানি, চর্ম রোগ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এছাড়া ধুতুরা, পেঁপে, নারিকেল, কাঁটানটে ইত্যাদি গাছ থেকেও অ্যালার্জি হয়।

কীটপতঙ্গ দূষণ ঃ মশা থেকে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়াসিস (গোদ) প্রভৃতি এবং মাছি থেকে কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধি হয়। সুতরাং মশা মাছি যাতে না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জল জমে থাকলেই সেখানে মশা হয় সুতরাং বাড়ির কাছে কোথাও যাতে জল জমে না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

শূয়রের দেহ থেকে মশার মাধ্যমে ভাইরাল (জাপানি) এনসেফ্যালাইটিসের ভাইরাস মানুষের দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং এমন ভাবে শূয়র পালন করতে হবে যাতে শূয়রকে মশা না কামড়াতে পারে। অন্যথায় শূয়রকে এনসেফ্যালাইটিস ভাইরাস প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

আবর্জনার মধ্যে রোগজীবাণুরা দ্রুতগতিতে বংশ বৃদ্ধি করে। সুতরাং বাড়ি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

ভূমিক্ষয় ঃ মাটির উপরিভাগ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়াকেই ভূমিক্ষয় বলে। সাধারণত গাছপালা না থাকলে মাটির উপরিভাগ সহজেই জল দ্বারা ধুয়ে নদীতে চলে যায় ফলে ভূমিক্ষয় হয়। ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির উর্বরতার বিশেষ হানি হয়। তীব্র বায়ুপ্রবাহের ফলেও ভূমিক্ষয় হয়।

সমুদ্রের জল অনেক সময় তীরভূমিকে গ্রাস করে, এতেও ভূমিক্ষয় হয়। এ বন্ধ করতে হলে সমুদ্রের ধারে ঝাউ ইত্যাদি গাছ লাগানো বা বাঁধ দেওয়া উচিত।

বালিখাদ, ইটখোলা, খনি ইত্যাদির জন্যও ভূমিক্ষয় হয়। এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। পরিত্যক্ত খনি বালি ইত্যাদি দ্বারা ভরাট করা উচিত।

জল দূষণ ঃ নদী, পুকুর ইত্যাদিতে মানুষ, গরু, মোষ, প্রভৃতির স্নান করার ফলে জল দূষিত হয়। তাছাড়া কাপড় কাচার (বিশেষ করে রোগীর কাপড়) জন্যও নদী, পুকুরের জল, দূষিত হয়।

শহরের নর্দমার দূষিত জল ও আবর্জনা এবং কলকারখানার নানাবিধ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ (তরল বা কঠিন) নদী বা সমুদ্রের জলে ফেলার জন্য জল-দূষণ ঘটে। এভাবে গঙ্গার জল অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়েছে। মনে রেখ সীসা, পারদ, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, অ্যান্টিমণি প্রভৃতির

যৌগরা অত্যন্ত বিষাক্ত। বেরিয়ামের সমস্ত দ্রবণীয় যৌগও অতি বিষাক্ত। এজন্য নর্দমা বা কলকারখানার জল বা তরল কখনও শোধন না করে নদী বা পুকুরে ফেলা অনুচিত।

গাছপালায় যেসব কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় সেগুলি জলে ধুয়ে নদী, পুকুরে এসে পড়লেও জল দূষণ ঘটে। জলে অ্যাসিড বৃষ্টি হলেও জল দূষিত হয়। জল দূষণের ফলে মাছেদের মৃত্যু হয়, এই মাছ খেলে মানুষও নানা রোগাক্রান্ত হয়।

মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকলে টিউবওয়েলের জলও দূষিত হয়। পশ্চিমবাংলার অনেক জায়গার নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। এই আর্সেনিক দুষ্ট জল ব্যবহার করলে নানারকম চর্মরোগ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। দেখা গেছে নলকূপ যথেষ্ট গভীর না হলেই তার জলে আর্সেনিক থাকে। জলে অনেক সময় অতিরিক্ত লোহাঘটিত লবণ থাকে। এই জলও, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

জলে নানাবিধ রোগ জীবাণু থাকার জন্য কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, হেপাটাইটিস, আমাশা ইত্যাদি রোগ হয়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ পেটের রোগের জন্যই দায়ী জীবাণুদুষ্ট জল। আর জলে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকলে চর্মরোগ, হজমের গোলমাল, লিভারের ব্যাধি, স্নায়ুরোগ, রক্তের ব্যাধি ইত্যাদি হয়। যেমন দীর্ঘদিন ধরে শরীরে সীসা প্রবেশ করলে স্নায়ুরোগ দেখা দেয় এমনকি মানুষ উন্মাদও হয়ে যেতে পারে।

জলের অপব্যবহারও বন্ধ করতে হবে, নাহলে জলের অভাবও দেখা দিতে পারে। গভীর নলকূপ বসানোর আগে মাটির নীচে বিভিন্ন স্তরে কতটা জল সঞ্চিত আছে তা নির্ণয় করতে হবে। নাহলে অতিরিক্ত গভীর নলকূপ বসানোর ফলে মাটির নীচের জলস্তর শুষ্ক হয়ে পড়ে জলের অভাব দেখা দেবে। গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনেক সময় জাহাজে করে পেট্রোলিয়াম ঘটিত পদার্থ একদেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। কোন কারণে জাহাজ দুর্ঘটনা হলে এই খনিজ তেল সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে পড়ে। এতে সমুদ্রের জল বিশেষ ভাবে দূষিত হয় এবং অসংখ্য মাছ ও সামুদ্রিক জীবের মৃত্যু হয়।

পুকুর, নদী ইত্যাদির জলে প্রাণীদের বর্জ্যপদার্থ, জীবজন্তুর মৃতদেহ ইত্যাদি জৈব পদার্থে বেশী থাকলে জলে ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি বিয়োজকদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই বিয়োজকরা জৈব পদার্থের পচন ঘটায় যার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অক্সিজেনের।

এতে জলের জৈব অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand —BOD) খুব বৃদ্ধি পায় ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায়। এতে মাছ ও জলের অন্য প্রাণীদের ক্ষতি হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জান গঙ্গার জলকে দূষণ মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার একটি প্রধান দিক হল বিভিন্ন শহরের নর্দমার জলকে আগে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে শোধিত করে তবেই গঙ্গায় ফেলা হবে। এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে নর্দমার ময়লা থেকে সার ও মিথেন ইত্যাদি হাইড্রোকার্বন উৎপন্ন করা হবে। এই হাইড্রো-কার্বন জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহার করা যায় বা তা থেকে বিদ্যুৎশক্তিও তৈরি করা যায়। এভাবে গঙ্গার দূষণ 75% কমান যায়।

খাদ্য দূষণ ঃ গাছপালায় যে সব পেষ্টিসাইড (Pesticide) প্রয়োগ করা হয় তার কিছু অংশ বিভিন্ন খাদ্য শস্য, ফল মূল ও শাক সব্জির মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। পেষ্টিসাইড তিনরকম, আগাছানাশক (Herbicides), ছত্রাকনাশক (Fungicides) ও কীটনাশক (Insecticides)। এসব পেষ্টিসাইড সহজে নষ্ট হয় না, ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে আমাদের দেহে সঞ্চিত হয়ে শেষে গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে। এজন্য কোন খাদ্যই ভাল করে না ধুয়ে (সম্ভব হলে গরম জলে) খাওয়া উচিত নয়।

এছাড়া মাংস, ফলের রস ইত্যাদি দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য তাতে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। এগুলিও ক্ষতিকর। খাদ্যদ্রব্যকে আকর্ষণীয় করে তার বিক্রি বাড়াবার জন্যও তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক গন্ধ ও রং মেশানো হয়। যেমন বোঁদেয় হলুদ ও লাল রং দেওয়া হয়, ঠাণ্ডা পানীয়ে রং ও গন্ধ মেশানো হয়, পটলকে তুঁতের দ্রবণে ডোবানো হয়, দইয়ে লাল রং মেশানো হয়, কার্বাইডের সাহায্যে ফল পাকানো হয়। ঐসবই অনিষ্টকর, হয়তো দুএকদিনে বিশেষ কোন ক্ষতি করেনা কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহারে নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এমনকি তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছো, কাটা আনারসে হলুদ রঙের লেড ক্রোমেট দেওয়া হয় যা কিনা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমাদের দেশে খাবারে ও ঔষধে ভেজাল মেশানোতো অতি সাধারণ ব্যাপার, যা কিনা পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধগুলির মধ্যে একটি।

ঔষধদূষণ : ঔষধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় (Side effects) অনেক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় যে সব ব্যাধি সৃষ্টি হয় তাদের বলে আয়াট্রোজেনিক ব্যাধি (Iatrogenic disease)। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ঔষধ খেলে এইসব ব্যাধি উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এইজন্য বেশীদিন ঔষধ খেতে হলে খুব সতর্কতার সঙ্গে খাওয়া উচিত।

অনেক ঔষধই লিভার, স্নায়ুতন্ত্র, চক্ষু, হার্ট বা কিডনির ক্ষতি করে, পেনি-সিলিন ইনজেকসানে এমন কি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ চিকিৎসার সময়ে মনে রাখতে হবে সুচিকিৎসার অর্ধেকই হল সঠিক রোগনির্ণয়। কারণ রোগনির্ণয়ে ভুল হলে ওষুধ খেয়ে রোগ তো কমবেই না বরং ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হবে। আর প্রতিটি জটিল ব্যাধিকে বিজ্ঞানের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করতে হবে।

স্নো, পাউডার, ক্রীম ইত্যাদি প্রসাধন দ্রব্যও বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এদের বেশী ব্যবহারে ত্বকের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি নানা-রকম চর্মরোগ ও অ্যালার্জিজনিত উপসর্গও দেখা দিতে পারে।

এছাড়া মোজা, গেঞ্জী ইত্যাদি অন্তর্বাস সর্বদা সুতীর পরা উচিত কারণ নাইলন, টেরিলিন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর অন্তর্বাস পরলে বিবিধ চর্মরোগ হতে পারে। নাইলনের মোজা পরলে অনেকের পায়ে দুর্গন্ধ ঘাম হয়।

ডিটারজেন্টের সাহায্যে জামাকাপড়, বাসনকোসন পরিষ্কার করার সময় ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয় কারণ জামাকাপড়, বাসনকোসনে ডিটার-জেন্টের সূক্ষ্মকণা লেগে থাকলে তা থেকে বিভিন্ন ব্যাধি, চর্মরোগ, অ্যালার্জি হতে পারে।

নেশা : সব নেশাই ক্ষতিকর। সিগারেট খেলে ক্যানসারের সম্ভাবনা যে অনেক বেড়ে যায়—এতো তোমরা সবাই জান। সিগারেটের ধোঁয়াও বায়ুদূষণ ঘটায়, এজন্য কেউ সিগারেট খেলে তার চারপাশের লোকজনের শরীরেও দূষণ ঘটে।

আজকাল আবার হেরোয়িন ইত্যাদি ড্রাগের মারাত্মক নেশাও খুব বেড়ে গেছে। এসব নেশা মানুষের শরীর ও মনকে একেবারে পঙ্গু করে দেয় আর এসব নেশা একবার ধরলে ছাড়াও খুব কঠিন।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, কর্মদক্ষতা কমে যায় এবং তারা সহজেই নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এজন্য দেশের আর্থিক ক্ষতিই হয় বহু কোটি টাকার। এছাড়া সব রকমের অপরাধও প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ড্রাগ সেবনের আর একটি মারাত্মক কুফল হয়, ড্রাগে আসক্ত নারীরা শারীরিক মানসিক রোগগ্রস্ত, এমন কি বিকলাঙ্গ সন্তানের পর্যন্ত জন্ম দিতে পারেন।

নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা যে শুধু নিজের ও পরিবারের সর্বনাশ করে তাই নয় অন্যদেরও সর্বনাশ ডেকে আনে। যেমন যেসব ড্রাগে আসক্ত ব্যক্তি কলকারখানায় কাজ করে তারা প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায় ফলে অন্যরাও বিপদগ্রস্ত হয়। ড্রাগে আসক্ত হয়ে বা মদ খেয়ে গাড়ি চালাবার ফলে প্রচুর পথ দুর্ঘটনাও ঘটে।

তবে মনে রাখতে হবে নেশায় আসক্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের সর্বনাশ করে আর অপরের যে ক্ষতি করে তা করে নেশার প্রভাবেই। সুতরাং তাদের প্রাপ্য আমাদের সহানুভূতি, আমাদের সবসময়ই চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সুস্থ জীবনে আবার ফিরে আসতে পারে। অবশ্য কারণ যাই হোক না, যারা জীবনে পিছিয়ে আছে আমাদের উচিত তাদের অবজ্ঞা না করে জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

অনেক দেশে ড্রাগের চোরাকারবারীরা বহু টাকা সঞ্চয় করে এত প্রভাবশালী ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে তারা সৎ পুলিশ অফিসার ও বিচারকদের খুন করতেও দ্বিধা করে না। এমনকি অনেক দেশের সরকারকেও তারা কিনে নিয়েছে।

আমাদের পক্ষে ভয়ের কথা হোল বর্তমানে পশ্চিম দেশগুলিতে হেরোয়িনের বদলে দক্ষিণ আমেরিকার কোকেনের চল বেড়ে যাওয়ায় সোনালি ত্রিভুজ (Golden triangle অর্থাৎ লাওস, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড) ও সোনালি ক্রিসেণ্টের (Golden crescent অর্থাৎ ইরান, আফগানিস্থান ও পাকিস্থান) অন্তর্গত দেশগুলির হেরোয়িন চোরাকারবারীরা এশিয়ার দেশগুলিতে তাদের ব্যবসা বাড়াবার চেষ্টা করছে।

মনে রেখ, ড্রাগ মানুষের যুক্তি বিচারের ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে অবাস্তব

কল্পনার জগৎকে বাস্তব বলে ভাবতে শেখায়। এ হিসাবে সব ড্রাগই বিজ্ঞানের শত্রু।

শব্দদূষণ : শব্দ কতটা জোরালো তা মাপা হয় বেল ও ডেসিবেলে, এক বেল=10 ডেসিবেল।

সাধারণ কথাবার্তার প্রাবল্য 50 ডেসিবেল, জোরে কথা বলার প্রাবল্য 65 ডেসিবেল, অনেক কলকারখানার শব্দের প্রাবল্য এমনকি 10 বেলেরও বেশী।

দেখা গেছে 7-8 বেলের চেয়ে জোরালো শব্দ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। শব্দদূষণ থেকে বধিরতা, উদ্বেগ, রক্তচাপবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিহ্রাস, মানসিক দুর্বলতা ইত্যাদি ঘটতে পারে। এমনকি হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র শব্দ (যেমন গাড়ির বৈদ্যুতিক হর্ণ) শুনলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শব্দদূষণ বন্ধ করতে হলে মাইকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গাড়ির বৈদ্যুতিক হর্ণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। পটকা ইত্যাদি শব্দ উৎপাদনকারী বাজিও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জেট বিমান ও কলকারখানার শব্দও যাতে সীমার মধ্যে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের কানে প্রয়োজন হলে প্যাড ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

আশা করি এখন থেকে তোমরা শব্দদূষণ বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে। অবশ্য তোমরা নিজেরাই অনেকে গোলমাল চেঁচামেচি পছন্দ কর!

উষ্ণতাদূষণ : অত্যধিক গরমে বা ঠাণ্ডায় মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, শুধু মানুষের কেন সব জীবেরই অসুবিধা হয়। এটাই উষ্ণতাদূষণ।

ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল বা দই খাওয়া অনুচিত, এতে সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, সাইনুসাইটিস ইত্যাদি নানাপ্রকার শ্বাস রোগ হয়। অনেকের ধারণা দই খেলে ঠাণ্ডা লাগে বা গলা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল, দই এমনকি টক দই খেলেও ঠাণ্ডা লাগে না। আসলে ফ্রিজের দই খেলেই ঠাণ্ডা লাগে।

গরমকালে এয়ার কণ্ডিশানড ঘরে থাকলেও ক্ষতি হয়। অবশ্য কেউ যদি সারাক্ষণ এয়ার কণ্ডিশানড ঘরে থাকে তাহলে তার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কেউ যদি কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ঘরে থেকে আবার কিছুক্ষণ বাইরের গরমে থাকে তাহলে তার শরীর এই উষ্ণতার পার্থক্য মানিয়ে নিতে পারে না ফলে তার নানাবিধ শ্বাসরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কেউ শীতপ্রধান দেশ থেকে গরম দেশে গেলে হিট অ্যালার্জির জন্য অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

নদী, পুকুর ইত্যাদির জল গরম হলে মাছেদের ক্ষতি হয়। এছাড়া গরম জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এর ক্ষতিকর প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। কলকারখানার (বিশেষ করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেশিন ঠাণ্ডা করার) গরম জল অনেক সময় পুকুর বা নদীতে ফেলা হয়। এটা বন্ধ করা উচিত।

তেজস্ক্রিয়তা দূষণ: সবচেয়ে মারাত্মক হোল তেজস্ক্রিয়তা দূষণ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে অবিরাম যে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বেরোয় তা নানা জটিল ব্যাধির সৃষ্টি করে যেমন ক্যানসার ও রক্তের বিভিন্ন রোগ। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী বলে মানুষের শরীরে একবার প্রবেশ করলে চিরজীবন তার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষকে ভোগ করতে হয়।

তবে তেজস্ক্রিয়তার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হোল, তেজস্ক্রিয়তা জীনের পরিবর্তন (mutation) ঘটায় বলে এর কুফল বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। ফলে সন্তানসন্ততিদের মধ্যে দেখা দেয় নানা বংশগত ব্যাধি এবং শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুতা।

কোন কোন দেশে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত করে সংরক্ষণ করার জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এসব খাদ্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত। এমন কি রোগ নির্ণয়ের জন্য ঘন ঘন এক্সরে করাও অনুচিত, এতে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এজন্য বর্তমানে এক্সরের বদলে আল্ট্রাসোনিক শব্দের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতির প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের আরেকটি আধুনিক পদ্ধতি হোল এণ্ডোস্কোপি (Endoscopy)। এই পদ্ধতিতে গ্যাস্ট্রোস্কোপ (Gastroscope), সিস্টো-স্কোপ (Cystoscope) ইত্যাদি যন্ত্রের (যাদের সাধারণভাবে বলা হয় এণ্ডোস্কোপ) সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অভ্যন্তরভাগের ছবি দেখা যায়।

পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে পরিবেশ সমস্যা সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক কমিটি (Scientific Commitee On Problems of the Environment—SCOPE) পরমাণু যুদ্ধের পরিবেশগত ফলাফল (Environmental Consequences of NUclear WARfare, ENUWAR) নামে এক ব্যাপক

গবেষণা কার্য চালান। দুই খণ্ডে 900 পৃষ্ঠায় এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার বিপদগ্রস্ত এই গ্রহ পৃথিবী (Planet Earth in Jeopardy) নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী পরমাণু যুদ্ধের ফলে মানুষের মৃত্যু হবে তিনভাবে।

প্রথমত উত্তর গোলার্ধেই যুদ্ধটা হবে বলে ধরে নিলে পরমাণু বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উত্তর গোলার্ধে মারা যাবে দশ থেকে একশ কোটি মানুষ।

দ্বিতীয়ত সমস্ত পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষে মারা যাবে চারশ থেকে পাঁচশ কোটি মানুষ। উত্তর গোলার্ধে ব্যাপক শস্যহানির ফলেই এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এই শস্যহানির প্রধান কারণ পারমাণবিক শীত (Nuclear Winter)।

পারমাণবিক শীত বলতে বোঝায় পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা কমে যাওয়া। অর্থাৎ যুদ্ধটা শীতকালে হলে শীতের তীব্রতা বাড়বে আর গরমকালে হলে গরম পড়বে না বরঞ্চ অল্প শীতভাব থাকবে। আর গরমকালেই যেহেতু বেশীরভাগ শস্য হয়, সেসময়ে গরম না পড়লে ব্যাপক শস্যহানি ঘটবে। অবশ্য যুদ্ধটা শীতকালে হলে অতটা ক্ষতি হবে না। আবার যুদ্ধটা সমুদ্রের উপরে হলে উষ্ণতা বিশেষ কমবে না।

পারমাণবিক শীতের কারণ কি? কারণ হল, পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে তা ঘন কালো মেঘের মত পৃথিবীকে ঘিরে থাকবে। তারপর এই মেঘ আরও উপরে উঠে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করবে। এই ধোঁয়ার মেঘের জন্য ভূপৃষ্ঠে সূর্যের আলো ও তাপ প্রবেশ করতে পারবে না ফলে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা কমে যাবে।

এখন যেখানে যত উপরে উঠা যায় বায়ুর উষ্ণতা তত কমে যায় তখন কিন্তু বিপরীত হবে। অর্থাৎ নীচের বাতাস থাকবে ঠাণ্ডা কিন্তু উপরের ধোঁয়ার মেঘ সূর্যের তাপে থাকবে উত্তপ্ত। এর নাম দেওয়া হয়েছে উষ্ণতার ইনভার্সান (Temperature inversion)। অবশ্য ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতাহ্রাস খুব বেশী হবে না কিন্তু গরমকালে ঠিকমত গরম না পড়লেই ব্যাপক ফসলহানি হবে। দক্ষিণ গোলার্ধে অবশ্য এই পারমাণবিক শীত দেখা দেবে না। কিন্তু উত্তর গোলার্ধেই বেশীর ভাগ শস্য উৎপন্ন হয় বলে দক্ষিণ গোলার্ধেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

তৃতীয়ত তেজস্ক্রিয়তার জন্যও অনেক লোক মারা যাবে। শুধু যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের ফলেই তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হবে তা নয়, পরমাণু বোমার

আঘাতে যে সব পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস হবে তা থেকেও তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হবে। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেসব অত্যন্ত সক্রিয় পরমাণু জ্বালানি দণ্ড (Fuel rod) থাকে তা বোমার আঘাতে চারপাশে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলেই এই তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেবে। তেজস্ক্রিয়তার ফলে উত্তর গোলার্ধের শতকরা প্রায় আট ভাগ জায়গা মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

অবশ্য পরমাণু যুদ্ধের ফলে সঙ্গে সঙ্গে যত মৃত্যু ঘটবে বা দুর্ভিক্ষের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে যত মৃত্যু ঘটবে তার তুলনায় তেজস্ক্রিয়তার ফলে মৃত্যু অনেক কম হবে। তবে তেজস্ক্রিয়তার জন্য জীনের পরিবর্তনের ফলে অনেক দুরারোগ্য বংশগত ব্যাধি দেখা দেবে।

ইয়োরোপ আমেরিকায় তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতায় আতঙ্কিত। এ ব্যাপারে চারটি আমেরিকান কিশোর কিশোরীর মনোভাব নীচে দেওয়া হোল।

একটি আট বছরের ছেলে হল্‌, বিস্ফোরণের তিরিশ মাইল দূরে থেকে তেজস্ক্রিয়তায় মরার চেয়ে আমি বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গেই মারা যেতে চাই (I'd rather die instantly than be 30 miles away from the bomb and die of radiation poisoning—Hal)।

একটি পনেরো বছরের মেয়ে সুসি, বেঁচে থাকা কঠিন হবে···। আমি অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবি, পরমাণু যুদ্ধের পরেও আমি এখানে বেঁচে থাকলে কি হবে—আর ভাবলেই আমার মন বিষণ্ন হয়ে পড়ে। সম্ভবত আমি ধীরে ধীরেই মারা যাব (It'd be difficult to stay alive···Sometimes I wonder what would happen if I was still here after a nuclear war—and I start worrying. I would probably just die slowly—Susy)।

একটি পনেরো বছরের কিশোর ডেরেক, আমরা এতসব শহর তৈরি করেছি, লোকেদের এতসব ছেলেমেয়ে—আর তারা সবাই নিহত হতে চলেছে। পরমাণু যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার আশা এখন নেই (We build all these cities, people have all these children—and they're all just going to get killed. There's no stopping of nuclear war now—Derek)।

সতেরো বছরের কিশোরী মণিকা, আমি নিশ্চিত, পরমাণু আক্রমণ হলে

আমি বেঁচে থাকব না—অন্ততঃ আমি আশা করি যে বাঁচব না। এমন বিশেষ কিছুই থাকবে না যার জন্য বাঁচা যায় (I'm sure I wouldn't survive a nuclear attack—at least I hope I wouldn't. There wouldn't be much to survive for—Monica)।

দেখা যাচ্ছে পরমাণু যুদ্ধের পরে যে এই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার আর বিশেষ কোন সার্থকতা থাকবে না তা একটি কিশোরীও বুঝতে পেরেছে কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদেরও তা বোঝার ক্ষমতা নেই !

মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে শুধু পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করলেই হবে না, তার জন্য চাই সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ (Total disarmament)। মানুষ খুন করাতেই যাদের আনন্দ সেইসব বর্বর যুদ্ধবাজদের সেইজন্য বলতে হবে, মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিজ্ঞানকে কোন অবস্থাতেই মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চলবে না ; কারণ বিজ্ঞানকে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয় !

শুধু পরমাণু বোমা নিষিদ্ধ করলেই হবে না সেইসঙ্গে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এসব ক্ষেত্রেও দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয়তায় অনেক লোক মারা যেতে পারে বা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চের্নোবিল (Chernobyl) পরমাণু দুর্ঘটনার কথাতো তোমরা সবাই জান। এর আগেও এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরেকটি বিরাট অসুবিধা হোল, এর ফলে উৎপন্ন পরমাণু আবর্জনা (Nuclear garbage) কোথায় ফেলা হবে তা নিয়ে সমস্যা ; কারণ, এই আবর্জনা প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়। পরমাণু চুল্লীতে (Nuclear Reactor) ভারী মৌলের পরমাণু বিভাজনের (Fission) সাহায্যে পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করার সময় যে নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটে তাতেই এই পরমাণু আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এই আবর্জনার ক্ষতিকর প্রভাব এক হাজার থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত বজায় থাকে বলে একে এক হাজার থেকে দশ হাজার বছর পর্যন্ত সমস্ত জীবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। সমুদ্রে বা মাটির উপর এই আবর্জনা ফেলে রাখলে পরিবেশ ভয়াবহভাবে দূষিত হয়।

এই সমস্যার সঠিক সমাধান এখনও বার করা যায় নি। বর্তমানে সাধারণত

এই আবর্জনা মাটির প্রায় 1000 মিটার নীচে নিশ্ছিদ্র ড্রামের মধ্যে সমাহিত করা হয়। কিন্তু এতে সমস্যা হোল ভূমিকম্পের ফলে এই আবর্জনা আবার উপরে উঠে আসতে পারে।

এইজন্য বিজ্ঞানীরা এই আবর্জনা মেরুর বরফের নীচে বা সমুদ্রের গভীর তলদেশে সমহিত করার এমন কি মহাকাশে পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

তবে সবচেয়ে ভাল হোল পরমাণু বিভাজনের বদলে নিয়ন্ত্রিত পরমাণু সংযোজনের (Fusion) সাহায্যে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। এর মস্ত বড় সুবিধা এই যে এক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি না হওয়ায় তেজস্ক্রিয়তা দূষণ দেখা দেয় না। অবশ্য এটা বাস্তবে রূপায়িত করার অনেক বাধা আছে। তবে বিজ্ঞানীরা এসব বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমানে চেষ্টা করছেন।

ইকোলজি ঃ সব জীবই তার পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। আবার প্রাণী ও উদ্ভিদও পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ইকোলজি (Ecology) হোল জীববিজ্ঞানের সেই বিভাগ যেখানে জীবের উপর তার পরিবেশের প্রভাব ও জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আর কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সমস্ত জীব ও তাদের জড় পরিবেশকে একত্রে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)। বাস্তুতন্ত্র হোল ইকলজির কার্যকরী একক (Functional unit)। উদাহরণ স্বরূপ কোন পুকুর তার সব প্রাণী, উদ্ভিদ, জল ও জড় উপাদানসহ একটি বাস্তুতন্ত্র। কোন বনও একটি বাস্তুতন্ত্র।

পৃথিবীর যেই অংশে জীব বাস করে তাকে বলে জীবস্তর (Biosphere) সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা 7 কিমি আবার পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা 6 কিমি। সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাহাড়ের শীর্ষ পর্যন্ত জীবেরা বাস করে। সুতরাং জীবস্তরের বেধ $7+6=13$ কিমি। কেবল জীবস্তরেই বাস্তুতন্ত্র থাকতে পারে।

ভূপৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলে সমস্ত জীব (বা কোন বিশেষ জীব) মোট যত থাকে তাদের মোট ভরকে বলে সমস্ত জীবের (বা কোন বিশেষ জীবের) বায়োমাস (Biomass)।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, জীববস্তু (Biotic factor) ও জড়বস্তু (Abiotic factor)।

জীববস্তু আবার দুরকম, উৎপাদক (Producer) ও ভক্ষক (Consumer)। যারা সালোক সংশ্লেষের সাহায্যে আলোক শক্তিকে, রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে তা থেকে নিজেদের শক্তির চাহিদা মেটায় তাদের বলা হয় উৎপাদক। আর যারা আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে না বলে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তি থেকেই নিজেদের শক্তির চাহিদা মেটায় তারা হোল ভক্ষক। উৎপাদকদের স্বভোজীও (Autotroph) বলা হয় কারণ এরা খাদ্যের জন্য অন্য কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে না, বিভিন্ন অজৈব উপাদান থেকে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই প্রস্তুত করতে পারে। সাধারণ উদ্ভিদরা হোল উৎপাদক। ভক্ষকেরা হোল পরভোজী (Heterotroph) কারণ এরা খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে।

পুকুর নদী, সমূদ্রে যে সব আণুবীক্ষণীক জীব থাকে তাদের বলে প্ল্যাঙ্কটন। এদের মধ্যে যারা প্রাণী তাদের বলে জুপ্ল্যাঙ্কটন (Zooplankton) আর যারা উদ্ভিদ তারা হোল ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (Phytoplankton।

শৈবাল (শেওলা, Algae) ইত্যাদি ক্ষুদ্র সবুজ উদ্ভিদরা হোল ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন। সমূদ্রের যতটা গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলোক পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত এরা থাকে। উৎপাদক হিসাবে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনদের স্থান স্থলভাগের উদ্ভিদদের চেয়ে অনেক উপরে।

পরভোজীদের আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, প্রাথমিক (Primary), সেকেণ্ডারি (Secondardy) ও টার্সিয়ারি (Tertiary) খাদক ও বিযোজক (Decomposer)। যে সব খাদকের খাদ্য শুধু উদ্ভিদ তারা হোল প্রাথমিক খাদক যেমন গরু; ছাগল। যে সব খাদকের খাদ্য প্রাথমিক খাদক তারা হোল সেকেণ্ডারি খাদক যেমন কুকুর বিড়াল। আর যারা সেকণ্ডারি খাদকদেরও খায় তারা হোল টার্সিয়ারি খাদক যেমন বাঘ, সিংহ।

আর ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক (Fungus) ইত্যাদি যারা খাদ্যের (সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ) পচন ঘটিয়ে তাদের সরল উপাদানে (প্রধানত অজৈব) যেমন নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদিতে বিশ্লিষ্ট করে তাদের বলে বিযোজক। ছত্রাক হোল নিম্ন শ্রেণীর

ক্লোরোফিল হীন উদ্ভিদ যেমন ব্যাঙের ছাতা। ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ারা সাধারণত পরজীবী (Parasite) বা মৃতজীবী (Saprophyte) হয়।

প্রাথমিক, সেকেণ্ডারি ও টার্সিয়ারি খাদকদের সাধারণ ভাবে ম্যাক্রোকনজিউমার (Macrcconsumer) এবং বিয়োজকদের মাইক্রোকনজিউমার বলা হয়।

খাদ্য শৃঙ্খল ঃ উৎপাদকরা সরল অজৈব উপাদান থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে। বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্ষকরা আবার উৎপাদক বা অন্য ভক্ষকদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। বিয়োজকরা আবার সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে সরল অজৈব পদার্থে বিশ্লিষ্ট করে। সুতরাং উৎপাদক, ভক্ষক ও বিয়োজকদের মধ্যে দিয়ে খাদ্যবস্তু চক্রাকারে আবর্তিত হয়। খাদ্যের এই চক্রাকার আবর্তনকে বলে খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain)।

বাস্তুতন্ত্রের স্ব-নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্য ঃ বাস্তুতন্ত্রের স্বনিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্য (Self-regulatory Character) আছে। অর্থাৎ কোন বাস্তুতন্ত্রের কোন একটি উপাদান অত্যধিক বেড়ে বা কমে যেতে পারে না। বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় থাকে। কোন উপাদান বেড়ে বা কমে গেলে অন্য উপাদানগুলিও এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, যে উপাদানটির বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়েছিল সেটির আবার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়ে পূর্বের অনুপাত ফিরে আসে।

যেমন মনে কর কোন বনে বাঘ ও তার খাদ্য হরিণ আছে। কোন কারণে বাঘের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা বেশী হরিণ খেয়ে ফেলে, ফলে, হরিণের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বাঘের খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এতে খাদ্যাভাবে বাঘের সংখ্যাও কমে যায়। আবার হরিণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বেশী খাদ্য পাওয়ায় বাঘের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ফলে হরিণের সংখ্যা আবার কমে যায়। সুতরাং সব ক্ষেত্রেই বাঘ ও হরিণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় থাকে।

তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানুষ কর্তৃক নির্বিচার হত্যা ইত্যাদি কারণে বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের নির্দিষ্ট অনুপাত বিঘ্নিত হতে পারে। এরকম হলে তা কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি করে। যেমন প্রথমে যখন ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়া যায় তখন সেখানে কোন খরগোশ ছিল না। আঠারো শতকের শেষ দিকে সেখানে প্রথম খরগোশ নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানে খরগোশের

শত্রু কোন প্রাণী না থাকায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। ফলে বহু শস্য তারা খেয়ে নষ্ট করে আর শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে আর বহু অর্থব্যয়ে খরগোশের উৎপাত থেকে দেশকে রক্ষা করা হয়।

একটি জীব যেমন অন্য জীবের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল, একটি বাস্তুতন্ত্রও তেমন অন্য বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। যেমন মনে কর বনের মধ্যে একটি পুকুর আছে। বন হতে নানাবিধ জৈব ও অজৈব বস্তু পুকুরে এসে পড়ছে। আবার বন্যপ্রাণীরা পুকুরের জল ও মাছ ভক্ষণ করছে। সুতরাং বন ও পুকুরের বাস্তুতন্ত্র পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ ঃ বাস্তুতন্ত্রে খাদ্য চক্রাকারে আবর্তিত হলেও শক্তির প্রবাহ কিন্তু একমুখী। কারণ উৎপাদক হতে বিয়োজক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই কিছু শক্তির অপচয় হওয়ায় শক্তির পরিমাণ ক্রমশ কমে যায়।

প্রথমত উৎপাদকরা সূর্যের আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে নিজেদের দেহে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু উৎপাদকদের বিপাক (Metabolism) এর জন্য কিছু শক্তি ব্যয় হয়। আবার ভক্ষকদের বিপাক ক্রিয়ার জন্যও কিছু শক্তির অপচয় ঘটে। সুতরাং উৎপাদকদের চেয়ে ভক্ষকদের মধ্যে শক্তির পরিমাণ কম হয়। অবশেষে বিয়োজকরা সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে সরল উপাদানে পরিণত করলে সেই উপাদানগুলির মধ্যে শক্তি প্রায় থাকে না বললেই চলে। সুতরাং শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে আর সমস্ত শক্তির মূল উৎস সূর্য।

ইকলজি ও আর্থিক উন্নয়নের মধ্যে কোনটিকে আমরা অগ্রাধিকার দেব সেবিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নেই। কারণ পরিবেশকে দূষিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত মানুষের মহা ক্ষতি করে। একদিকে যতটা আর্থিক সমৃদ্ধি হয় অন্যদিকে পরিবেশ দূষণের ফলে তার চেয়ে অনেক বেশী আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া পরিবেশ দূষণের ফলে নানা রোগ ব্যাধি তো দেখা দেয়ই।

সুতরাং আমরা বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইকলজির অধীন (Economy is a sub-system of Ecology)।

পরিবেশ সংরক্ষণ (Conservation) ঃ

তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়, বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের নির্দিষ্ট অনুপাত যাতে বিঘ্নিত না হয় তা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ করতে না পারলে পৃথিবী থেকে সমস্ত মানবজাতির অস্তিত্বই মুছে যাবে। সংরক্ষণ বলতে বোঝায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের এমনভাবে ব্যবহার যাতে দূষণ না ঘটে এবং ব্যবহারের ফলে যে ক্ষয় হল তার যথাসম্ভব পূরণ হয়।

সৌরশক্তি ও সমুদ্রের নোনাজল প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ। পক্ষান্তরে মিষ্টিজল, বন, প্রাণীজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বায়ুর অক্সিজেন ও জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil fuel) অর্থাৎ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ঘটিত জ্বালানি প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ। এই ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলির সংরক্ষণে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়, পুনর্গঠন ক্ষমতাহীন ও পুনর্গঠন ক্ষমতাযুক্ত।

যেসব ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ নতুন ভাবে প্রস্তুত করা যায় না তারা হল পুনর্গঠন ক্ষমতাহীন সম্পদ (Non-renewable resources) যেমন খনিজ পদার্থ ও জীবাশ্ম জ্বালানি। আর যেসব সম্পদ প্রস্তুত করা সম্ভব তাদের বলে পুনর্গঠন ক্ষমতাযুক্ত সম্পদ যেমন বনজ সম্পদ, প্রাণীজ সম্পদ, বায়ুর অক্সিজেন, মিষ্টি জল।

মিষ্টিজল ঃ মিষ্টিজলের (Fresh water) উৎস দুটি যথা পর্বতশীর্ষের বরফগলা জল যা নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে আর বৃষ্টির জল। সুতরাং প্রয়োজনমত বাঁধ দিয়ে নদী ও বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে যাতে খরার সময় জল পাওয়া যায়। এতে বন্যাও নিয়ন্ত্রিত হবে।

বন ঃ মানুষের জীবনে গাছের বিরাট ভূমিকাতো তোমরা জানই। গাছ থেকে আমরা খাদ্য, জ্বালানি, কাঠ, নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ পাই। তাছাড়া গাছ ও ফুলের সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধও করে।

তবে গাছের একটি মস্ত বড় উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অসচেতন। আর তা হোল পরিবেশ দূষণ রোধে গাছের বিরাট ভূমিকা। গাছ শুধু যে সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমায় ও অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায় তাই নয়, গাছ বাতাসের অনেক দূষিত গ্যাসকেও

শোষণ করে। দেখা গেছে একটি বড় গাছ তার সারাজীবন যতটা পরিবেশ দূষণ রোধ করে তার দাম কয়েক লক্ষ টাকা অর্থাৎ মানুষকে এতটা পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হলে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে হোত।

ভূমিক্ষয় রোধে গাছের বিরাট ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। মাটিতে গাছ বা ঘাস থাকলে বৃষ্টির জল সহজে মাটিকে ধুয়ে নিতে পারে না কারণ গাছের শিকড় মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর ঘাস মাটির উপর আবরণ সৃষ্টি করে। ফলে ভূমিক্ষয় হয় না।

যেখানে তীব্র বায়ুপ্রবাহের জন্য ভূমিক্ষয় হয় সেখানে এমনভাবে সারি বেঁধে গাছ লাগানো হয় যাতে এই গাছের সারি বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়। ফলে ভূমিক্ষয় কম হয়। ওইরকম গাছের সারিকে বলে রক্ষী বন্ধনী (Shelter belt)। এছাড়া গাছ না থাকলে বৃষ্টিপাতও কমে যায় ফলে দেশ ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন কোন দেশের পরিবেশের সঠিক সংরক্ষণের জন্য অন্ততঃ 30% বনাঞ্চল থাকা দরকার। এ হিসাবে আমাদের দেশে অরণ্য আছে খুবই কম। ভারতে বনাঞ্চল আছে পাঁচ কোটি আটাশি লক্ষ হেক্টর এলাকায় অর্থাৎ আমাদের দেশের মাত্র 9% বনাঞ্চল।

সুতরাং বনসৃজনে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। তবে বনসৃজনে কোন্ কোন্ গাছ লাগানো হবে তা আগে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত, খেয়াল খুশী মত যে কোন গাছ লাগালেই হবে না। কারণ তোমরা আগেই দেখেছো কতকগুলি গাছ থেকে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

বনসৃজনে গাছ নির্বাচনের সময় চারটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(1) সেই গাছ যেন পরিবেশকে দূষিত না করে তার উন্নতিসাধন করে। এই হিসাবে ঝাউ, পুত্রাঞ্জীব, আকাশমনি ও এইল্যানথাস গাছ না লাগানোই উচিত কারণ এদের পরাগরেণু থেকে নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

(2) গাছ যেন মাটি থেকে বেশী জল শোষণ না করে কারণ তাহলে মাটির জলস্তর নীচে নেমে যাবে ফলে পানীয় ও সেচের জলের অভাব দেখা দেবে। এজন্য ইউক্যালিপটাস গাছ না লাগানোই ভাল কারণ এ মাটি থেকে প্রচুর জল টেনে নেয়।

(3) সেই গাছ যেন সেই দেশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে অর্থাৎ সেখানকার জলবায়ু ও মাটিতে দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে।

(4) বিভিন্ন ফলগাছ, ফুলগাছ ও নানা বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছ যেমন চন্দন ইত্যাদি বেশী করে লাগাতে হবে। সেই গাছের অর্থনৈতিক মূল্য আছে কিনা, যেমন তা থেকে ভাল কাঠ বা ব্যবহারোপযোগী বীজ পাওয়া যায় কিনা, তাও দেখতে হবে।

মনে রেখ শুধু গাছ লাগানোই যথেষ্ট নয়, সেই গাছ যাতে বড় হতে পারে সেইজন্য চাই তাদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এর জন্য গরু ছাগলে যাতে গাছ খেয়ে যেতে না পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর জল সেচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া অপরিণত গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। গাছ কাটলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বনে অগ্নিনিরোধ ও অগ্নিনির্বাপণের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শস্যের আবর্তন (Rotation of crops); অর্থাৎ জমিতে একই শস্যের চাষ না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্যের চাষ। বছরে একবার শিম বা ডাল জাতীয় গাছের চাষ করলে জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিম জাতীয় গাছের শিকড়ে এক ধরণের জীবাণু বাস করে, এই জীবাণুরা বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ প্রস্তুত করে। ফলে জমির উর্বরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং গাছকে ভালবাসতে হবে। মনে রেখ মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাই মানুষের জীবনের সমস্ত আনন্দ ও শক্তির মূল উৎস। আর যাদের মনে এই ভালবাসা নেই তারাই সহজে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে বা নেশার দাস হয়।

প্রাণীজ সম্পদ : বন্য প্রাণী সংরক্ষণেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। নির্বিচারে প্রাণীহত্যা পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। যেমন ব্যাঙ মেরে ফেললে কীট পতঙ্গের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ফলে ফসলের হানি ঘটে।

তাছাড়া পৃথিবীতে কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মানুষ খাদ্যের জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ হত্যা করতে

পারে ঠিকই কিন্তু তাই বলে কোন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদকে একেবারে নির্মূল করে দেওয়ার অধিকার মানুষের নেই। কারণ প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদই পৃথিবীর সম্পদ।

মানুষের বিবেচনাহীনতা ও নিষ্ঠুরতায় এ পর্যন্ত অনেক জীবই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে একটা গভীর লজ্জার কথা! দেখা গেছে 1600 সালের পর থেকে এ পর্যন্ত 349 রকম প্রজাতির প্রাণীর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে অবশ্য জীববিজ্ঞানীদের চেষ্টায় বিভিন্ন দেশে ক্ষয়িষ্ণু জীবদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে অন্য সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক অভিভাবক হল মানুষ। সেইজন্য কোন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদই যেন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তা দেখা মানুষের জীবনের এক অবশ্য কর্তব্য। আর কোন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদকে বিলুপ্ত করে দেওয়া মানুষের পক্ষে এক গুরুতর অপরাধ।

রি-ইউনিয়ন ও মরিশাস দ্বীপে আগে ডোডো (Dodo) পাখি দেখা যেত। পৃথিবীর অন্য কোথাও এই পাখি ছিল না। কিন্তু নাবিকদের নির্বিচার হত্যায় বর্তমানে ডোডো পাখি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

অনুরূপ ভাবে আমেরিকার যাত্রী পায়রা (Passenger pigeon) পাখিও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে।

পশ্চিমবাংলায় ইলিশ মাছ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হল গঙ্গার দূষণ ও বর্ষাকালে ডিম পাড়ার সময়ও ইলিশ মাছ ধরা। সুতরাং ডিম পাড়ার সময় ইলিশ মাছ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত।

এইজন্য ক্ষয়িষ্ণু প্রাণীদের রক্ষার জন্য সমস্ত পৃথিবীতেই বর্তমানে সংরক্ষিত বন (Reserve forest) ও অভয়ারণ্য (Sanctuary) স্থাপিত হয়েছে।

খনিজ সম্পদ : খনিজ সম্পদের সংরক্ষণের জন্য ধাতুর বদলে কাঠ ও প্লাস্টিকের ব্যবহার যথাসম্ভব বাড়ানো উচিত।

জীবাশ্ম জ্বালানি : জীবাশ্ম জ্বালানি প্রচণ্ড ভাবে পরিবেশ দূষিত করে বলে দূষণহীন শক্তির উৎস, যেমন বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার ভাঁটা, সমুদ্রের ঢেউ, সৌরশক্তি ইত্যাদির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইও প্রচণ্ডভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। এই ছাই থেকে ইট তৈরি করতে পারলে এ সমস্যা সহজেই মিটে যায়।

জনবিস্ফোরণ ঃ পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে, একে বলা হয় জনবিস্ফোরণ (Population explosion)। অবশ্য জনবিস্ফোরণ শুধু এশিয়া আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলিতেই ঘটেছে, ইউরোপ আমেরিকার ধনী দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি তো হচ্ছেই না বরঞ্চ কমার দিকেই তার ঝোঁক। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই জনবিস্ফোরণের মূল কারণ।

মনে রেখ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষই সবচেয়ে বেশী দূষণ সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শুধু যে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, পরিবেশ দূষিত হয় বা রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদির পরিমাণ কমে যায় তাই নয়, এর ফলে মানুষে মানুষে মমত্ববোধও কমে যায়।

জনবিস্ফোরণের আরেকটি খারাপ দিক হোল এর জন্য চাষের জমি বাড়াতে হয়, ফলে অরণ্য এলাকা কমে যায়। যেখানে তিনশ বছর আগে পৃথিবীর মোট ভূভাগের মাত্র 10% ছিল চাষের জমি, সেখানে জনবিস্ফোরণের ফলে বর্তমানে চাষের জমি 35%।

কোন স্থানের জনসংখ্যার ঘনত্ব (density) একটি নিম্নসীমার চেয়ে কম থাকলে মানুষকে দূষণরোধে বিশেষ কিছুই করতে হয় না প্রকৃতিই সেই কাজটা করে। আবার জনসংখ্যার ঘনত্ব একটি উর্ধ্বসীমার বেশী থাকলে দূষণ রোধ করা মানুষেরও সাধ্যের বাইরে চলে যায়।

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা শুধু জনবিস্ফোরণের মূল কারণ নয়, এ দুটো থেকে আরও নানা ধরনের দূষণের সৃষ্টি হয়। এজন্য অনেক সময় বলা হয় দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই মূল দূষণ !

নগর পরিকল্পনাকে (Town Planning) যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। বাড়ি ঘরে যথোপযুক্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে, বহুতল বাড়ি নিমার্ণের সময় চারপাশে যথেষ্ট খোলা জায়গা রাখতে হবে ও অগ্নিনির্বাপণের সুব্যবস্থা করতে হবে। বস্তি ও খাটাল উচ্ছেদ করতে হবে। বসতি অঞ্চলে কলকারখানা, গুদাম ইত্যাদি স্থাপন বন্ধ করতে হবে।

রাস্তাঘাট চওড়া করতে হবে ও পার্ক ইত্যাদি খোলা জায়গার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কতকগুলি বদভ্যাস যেমন বাসে ট্রামে সিগারেট খাওয়া, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা ইত্যাদিও বন্ধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল মনিটারিং সিস্টেম (Global Environmental Monitoring System) বা জেমস (GEMS) নামে একটি প্রকল্প তৈরি করেছে। এর উদ্দেশ্য সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞানার্জন।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে 1968 সালে ডাকা হয় এক আন্তর্জাতিক জীবস্তর সম্মেলন (International Biosphere Conference)। এই সম্মেলনে মানুষ ও জীববস্তর কর্মসূচি (Man And Biosphere programme) বা ম্যাব (MAB) নামে এক কর্মসূচি নেওয়া হয়। এর কাজ শুরু হয় 1971 সালে।

ম্যাবের উদ্দেশ্য হোল সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিবেশ ও জীবজগতের উন্নয়ন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা। ভারতেও ম্যাবের কাজ শুরু হয়েছে।

মনে রেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঠিক ব্যবহার যেমন মানুষের অশেষ কল্যাণ করতে পারে, অপব্যবহারও তেমনি ডেকে আনতে পারে মানুষের চরম সর্বনাশ। যেমন আগুন জ্বালিয়ে পড়াশোনাও করা যায় আবার বধূ হত্যার মত বর্বরতাও করা যায়। অবশ্য যতদিন মানুষের আদর্শ থাকবে, আমি ষোলআনার উপর আঠারো আনা জীবনকে উপভোগ করব আর সবাই শুকনো মুখে তাকিয়ে থাকবে, ততদিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপব্যবহার হবেই। এইজন্য আমদের মনে রাখতে হবে মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, এই মহাবিশ্বকে সুন্দর ও আনন্দময় করে গড়ে তুলে প্রতিটি মানুষের জীবনকে সার্থক করে তোলা আর এই মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করা।

একটা কথা আছে, পাগলেও নিজের ভাল বোঝে, অত্যন্ত ভুল কথা! প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমানেও নিজের ভাল বোঝে না, মূর্খেও পরের মন্দ বোঝে। আর নিজের ভালর চেয়ে পরের মন্দ করায় মানুষের বেশী আগ্রহের জন্যই আজ পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতার এই দশা!

আসলে মানুষ বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে) গ্রহন না করে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য (সমস্ত মানুষের কল্যাণের কথা না ভেবে) বিজ্ঞানের কতকগুলি আবিষ্কারকে গ্রহণ করার জন্যই আজ এত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একটা কথা আছে বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি গ্রহণ করা ব্রেকহীন গাড়ি চালানোর মতই বিপজ্জনক !

আর বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করে বিজ্ঞানের কতকগুলি আবিষ্কারকে গ্রহণ করা—এ যেন মাকে অবহেলা করে মায়ের অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করার মতলব !

সব শেষে মনে রেখ এই বিশ্বে বিজ্ঞানই একমাত্র জিনিষ যা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত রকমের দূষণ ও কলুষ থেকে মুক্ত কারণ বিজ্ঞানের মধ্যে কোনরকম ভণ্ডামি, বজ্জাতি, দম্ভ ও কদর্য রুচির স্থান নেই।